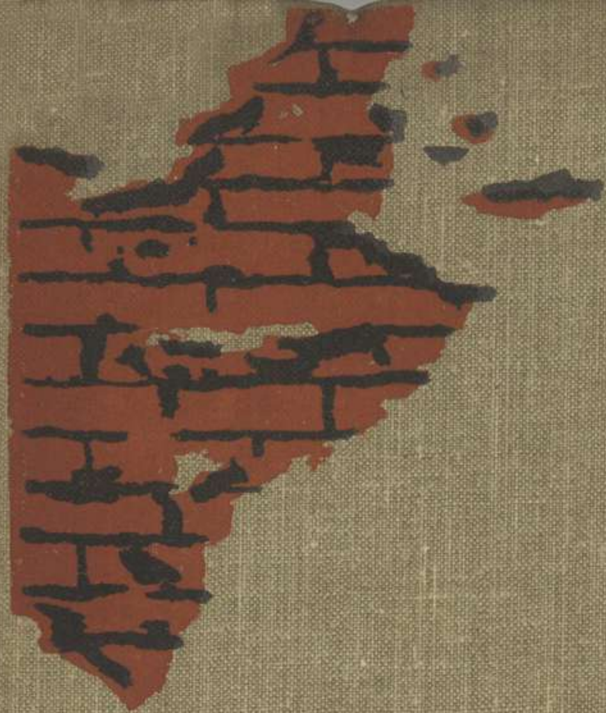

সের্গেই স্মির্নভ
ব্রেস্ত
কেল্লার বীর



সের্গেই স্মির

ব্রেস্ত কেল্লার বীর



ব্রেস্ত থেকে দেড় মাইল দূরে পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে রুশদের এক পুরোনো কেল্লা।

দেশরক্ষার মহান যুদ্ধের আগে এটিকে প্রধানত ব্যবহার করা হত ব্যারাক ও সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে। ১৯৪১এর ২২শে জুন। রাত্রিবেলা। কেল্লার পাহারায় রয়েছে শুধু ছোট একটি গ্যারিসন। প্রধান দলগুলি গেছে গ্রীষ্মকালীন শিক্ষাকেন্দ্রে। জার্মানরা একে সংখ্যায় বেশী, তাতে আবার আচমকা আক্রমণ করে বসে। দ্রুত তারা ব্রেস্তের উপর চড়াও হয়, এগিয়ে আসে দেশের ভিতরে।

লড়াই শুরু হবার কয়েক হপ্তা বাদে যুদ্ধক্ষেত্রের পুরোবর্তী দলে গুজব শোনা গেল শত্রুদলের অনেক পিছনে ব্রেস্ত কেল্লার বীর সৈনিকরা তখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। যে সব অফিসার আর সৈনিক বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসে আর যে বোমারুবহর রাতের বেলা শত্রুর

সের্গেই স্মির্নভ

ব্রেস্ত কেল্লার বীর

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

সূচীপত্র

যুদ্ধ !

১৯৪১এর ২২শে জুন। সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তরক্ষী চৌকি ও টহলদার সৈন্য আকাশের বুকে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পায়। পশ্চিমের ধূসর দিগন্তে নাজি-বিধ্বস্ত পোল্যাণ্ডের মাটির ওপর ভেসে ওঠে অদ্ভুত নানা রঙের তারা। ক্ষণস্থায়ী গ্রীষ্ম রাতের ম্রিয়মাণ তারাদের মাঝখানে এরা অসাধারণ উজ্জ্বল ও বিভিন্ন রঙের — সবুজ আর লাল। মিলিয়ে-যাওয়া রাতের ছায়াপথ বেয়ে এই নতুন তারাগুলো ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে পূর্বদিক পানে। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে সারা পশ্চিম দিগন্তে আর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিক থেকে কানে আসে ক্রমশ বেড়ে-ওঠা বহু ইঞ্জিনের গর্জন।

আওয়াজটা বাড়তে বাড়তে আকাশবাতাস ছেয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট রঙীন আলোগুলো আকাশ সীমানার অদৃশ্য রেখা পেরিয়ে একেবারে সীমান্তরক্ষীদের মাথার উপর উড়ে আসে। শত শত জার্মান বিমান বাতি জ্বালিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আকাশে হানা দিয়েছে।

উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে-থাকা সীমান্তরক্ষীরা এই ধৃষ্ট আক্রমণের মানে পুরোপুরি বুঝবার সুযোগ পেল না। পশ্চিমে ভোরের ছায়া কেঁপে উঠল বিদ্যুতের মত ঝলকের পর ঝলকে, সোভিয়েত ভূমির প্রথম কয়েক গজের উপর কালো মাটির চাপড়া ছিটকে উঠল, কয়েক মাইল জুড়ে মাটি আর আকাশ কেঁপে উঠল প্রচণ্ড কান-ফাটান আওয়াজে। গত কয়েকদিনের ভিতর গোপনে জমায়েৎ করা হাজার হাজার জার্মান কামান আর মর্টার থেকে সোভিয়েত সীমান্ত অঞ্চলে গোলাবৃষ্টি শুরু হয়, রাষ্ট্রের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ সীমান্ত কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গর্জমান, জ্বলন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়।

এই ভাবে শুরু হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের উপরে হিটলার জার্মানীর বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ, আরম্ভ হয় জার্মান ফ্যাশিস্ট হামলাদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের দেশ রক্ষার মহান যুদ্ধ।

সেদিন সকালে সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিস্তৃত সারা পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে একই সঙ্গে শুরু হয় সামরিক অভিযান। বারেণ্টস্ সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত এই সীমানা প্রায় দুই হাজার মাইল। সীমান্ত অঞ্চলে বিমান আর কামান থেকে প্রচুর বোমাবর্ষণের পর দু'শরও বেশী জার্মান, ফিন ও রুমানীয় ডিভিসন সোভিয়েত ভূমির উপর হামলা চালায়। হিটলারের সেনাপতিদের তৈরী তথাকথিত 'বারবারোশা পরিকল্পনা' অনুসারে এই আক্রমণ চলে।

জার্মান সৈন্যবাহিনী তিনটি শক্তিশালী দলে পূবে এগুতে

থাকে। উত্তরে লেনিনগ্রাদের দিকে বাল্টিক তীর বরাবর তার সৈন্যদল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিল্ড-মার্শাল ফন লীব। দক্ষিণে কিয়েভের দিকে ফিল্ড-মার্শাল রুন্‌স্তেদ্‌ট তার সৈন্যদল চালনা করে। কিন্তু সবচেয়ে শক্তিশালী শত্রুদল চড়াও হয় বিরাট সীমান্তের মধ্যখানে। এখানে, সীমান্ত সহর ব্রেস্ত থেকে একটি চওড়া অ্যাস্‌ফাল্‌ট্‌ বাঁধান সড়ক পূব দিকে চলে গেছে দেশের একেবারে মাঝখানে। বেলোরুশিয়ার রাজধানী মিন্‌স্ক, রাশিয়ার প্রাচীন সহর স্মলেন্‌স্ক, ভিয়াজ্‌মা ও মজাইস্কের ভিতর দিয়ে মস্কো গেছে এই সড়ক।

কেন্দ্রীয় সৈন্যদলের পরিচালক ফিল্ড-মার্শাল ফন বক। তার অধীনে পঞ্চাশটিরও বেশী ডিভিসন, সঙ্গে জেনারেল গুদেরিয়ান ও গট্‌টের পরিচালনায় দুটি শক্তিশালী সাঁজোয়া বাহিনী। প্রাচীর ভাঙ্গার ভারি ঢেঁকিকলের মত এই দুটো ট্যাংকবহর ব্রেস্তের উত্তর ও দক্ষিণ রক্ষাবাহিনী ভেদ করে সোভিয়েত ভূমির পশ্চাৎ অঞ্চলের গভীরে ঢুকে চওড়া বেড় দিয়ে মিন্‌স্কে এসে মিশতে চায়। উদ্দেশ্য, ব্রেস্ত ও মিন্‌স্ক সীমান্ত অঞ্চলের সোভিয়েত ডিভিসনকে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করে সশস্ত্র বেষ্টনীর মাঝে আটকে ফেলা। জার্মান সামরিক নেতাদের উদ্দেশ্য তাদের কেন্দ্রীয় সৈন্যদল দ্বারা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর প্রধান অংশকে নীপার নদীর ডান পারে থাকতেই ঘিরে ফেলে সাবাড় করার। তারপর নূতন করে হামলা করা স্মলেন্‌স্কের উপর এবং সেখান থেকে এগুনো মস্কোয়। শত্রুপক্ষ হিসেব করে, নীপারের জন্য লড়াইকারী সৈন্যদলকে সাবাড়

করার পর সোভিয়েত সামরিক নেতারা ফ্রণ্টে নূতন ডিভিসন জোগাড় করে পাঠাবার আগেই জার্মান ট্যাংক মস্কোতে ঢুকবে; এইভাবে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে লড়াইয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে।

দু'বছর ধরে যুদ্ধ করেও জার্মান সেনাপতিরা একবারও পরাজিত হয়নি। বল্‌কানের সাম্প্রতিক সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে তাদের এই বিশ্বাস আসে প্রাচ্য অভিযানও একইভাবে দ্রুত ও চূড়ান্ত সাফল্যে মণ্ডিত হবে। অভিযানের প্রতিটি কার্যক্রম এক সময়সূচী মত তৈরী হয়। চার সপ্তাহ বাদে রেড স্কোয়ারে যে জয়সূচক কুচকাওয়াজ হবে তার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ-প্রাক ভোজে অফিসাররা পানাহার করে।

লড়াইয়ের প্রথম দিকটায় মনে হল জার্মান সেনাপতিদের নিজেদের উপর এই আস্থা যথার্থ। ফ্রণ্টের ঘটনা হিটলারী সৈন্যবাহিনীর সম্পূর্ণ অনুকূলে। প্রথম আক্রমণ সম্পূর্ণ আচম্বিত, সীমান্ত অঞ্চলের সোভিয়েত সৈন্য রাতের বেলা এই হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সোভিয়েত ট্যাংক ও বিমান চালু হবার আগেই প্রথম কয়েক ঘণ্টায় জার্মান বিমানবহর এদের অনেকগুলোকে শেষ করে ফেলে। এ ভাবে শত্রুপক্ষ আকাশ যুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রাধান্য পায়। জার্মান বোমারু বিমান পিছিয়ে-আসা সোভিয়েত সৈন্যদল, অস্ত্রাগার, বোমা আর গোলাগুলির ভাণ্ডার, তেল গুদাম, সহর ও রেলজংশনের উপর ক্রমাগত বোমা ফেলতে থাকে। দ্রুতগামী বিমান গেঁয়ো রাস্তার ওপর এদিকে ওদিকে উড়ে আসতে থাকে ছোট ছোট

সৈন্যদলকে তাড়া করে, এমনকি পূবে সরে-যাওয়া পথিকদেরও রেহাই দেয় না।

মনে হয় সবকিছুই জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা মত চলেছে। ছক অনুযায়ী ২৭শে জুন গুদেরিয়ান ও গটটের ট্যাংকবহর মিন্স্কে এসে মিলিত হয়। বেলোরুশিয়ার রাজধানী দখলে আসে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে ঘিরে ফেলা হয়। তিন সপ্তাহ বাদে, ১৬ই জুলাই জার্মান বাহিনীর অগ্রবর্তী দল স্মলেন্স্কে ঢোকে। পিছন দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণে পিছিয়ে-আসা সোভিয়েত সৈন্যদল ঘেরাও হয়ে পড়ে, প্রচণ্ড ক্ষতি হয় তাদের। ফ্রন্ট পূব থেকে আরও পূবে সরে আসতে থাকে। এর মধ্যেই বার্লিন খবরের কাগজ জয়ের খবর ছড়িয়ে দেয়, বড়াই করে ঘোষণা করে যে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত, জার্মান সৈন্যদের মস্কো পৌঁছতে আর দেরী নেই।

কিন্তু যুদ্ধের সেই একেবারে প্রথম দিকেও জার্মান কর্তৃপক্ষের সামরিক চালে কি একটা অদৃশ্য জিনিষ বাধা জন্মাতে থাকে। সেটা এমন কিছু যা দূরদর্শী জার্মান অফিসারদের চিন্তার কারণ হয়। দেখা গেল পশ্চিমের লড়াইয়ের সঙ্গে পূব অঞ্চলের এই যুদ্ধের কোন মিল নেই। এখানকার প্রতিরোধ শক্তি আলাদা ধরনের, সোভিয়েত সৈন্যের আচরণ নাজি সমর নেতা ও সৈন্যদের স্বাভাবিক ধারণাকে বানচাল করে দিচ্ছে।

এর সুরু একেবারে সীমান্ত থেকে। আচমকা হলেও এবং অত্যাধিক শক্তিশালী ও সংখ্যাগুরু শত্রুপক্ষ তাদের অস্ত্রশস্ত্রের

বেশীর ভাগ ধ্বংস করে দিলেও সোভিয়েত সৈন্য বিস্ময়কর দৃঢ়তা নিয়ে আক্রমণ রুখতে থাকে। শত্রুকে এমনকি ছোটখাট জয়ের জন্যও দাম দিতে হয় অনেক। জার্মানি সমরবিজ্ঞানের সমস্ত আইনকে বাতিল করে প্রধান বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন, ছত্রভঙ্গ সোভিয়েত সৈন্যদল মরিয়া হয়ে প্রচণ্ড প্রতিরোধ চালাতে থাকে। এমনকি শত্রুর অনেক পিছনে যে সব ছোট ছোট দল ছড়িয়ে পড়েছিল এবং নিয়ম মাফিক যাদের অবধারিত সাবাড় হবার কথা তারা আত্মসমর্পণ না করে গভীর জঙ্গল আর জলাভূমির ভিতর দিয়ে পূবে এগিয়ে যায়, রাস্তার উপর শত্রুর ছোট ছোট দল আর যানবাহনের উপর দুঃসাহসী আক্রমণ চালায়, লড়াই করতে করতে ফ্রণ্ট লাইন পেরিয়ে আবার যোগ দেয় প্রধান বাহিনীর সঙ্গে। যারা পড়ে রইল শত্রুর পিছনে তারা ছোট ছোট সশস্ত্র দল তৈরী করে প্রচণ্ড পার্টিজান লড়াই শুরু করে। এতে শত্রুর দখল-করা অঞ্চলের লোকেরা ক্রমে ক্রমে বেশী অংশ নিতে থাকে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রণ্টেও সোভিয়েত সৈন্যের প্রতিরোধ শক্তিশালী হল। বেলোরুশিয়ার পশ্চিম জেলাসমূহে এবং বেরেজিনায় পিছন থেকে একরোখা প্রতিরোধ সামলিয়ে স্মলেন্‌স্কের জন্য দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তাক্ত সংগ্রামে সোভিয়েত সৈন্যের প্রথম শক্তিশালী পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় শত্রুকে। একদিকে বহু জয়, সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরাট কবলিত এলাকা, রাশিয়ার গভীরে জার্মান সৈন্যের দ্রুত অনুপ্রবেশ, কিন্তু তারই সঙ্গে দেখা দিল প্রথমদিককার এই লড়াইয়ে জার্মান

সৈন্যের প্রচণ্ড ক্ষতির আতঙ্কজনক সংখ্যা। নাজি সমর নেতাদের পরিকল্পনায় এই সংখ্যা সম্পূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব।

আর একটি অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য ব্যাপারে শত্রুপক্ষের নেতারা বিস্মিত ও হতচকিত হল। সমস্ত পশ্চিমী অভিযানে ফ্রণ্টের ওপারের শত্রু পিছিয়ে পড়ার ফলে দুর্বল ও ছত্রভঙ্গ হয়। তারপর মাত্র কয়েকটি আক্রমণেই তারা হয়েছে সম্পূর্ণ সাবাড়।

কিন্তু রাশিয়ায় ব্যাপারটা আলাদা। সত্য যে এখানেও ফ্রণ্ট লাইনের ওপাশে পরাজিত সৈন্যদল পিছু হটছে, কিন্তু আগেকার পশ্চিমী অভিযানগুলিতে যেমনটি ঘটেছিল এরা তেমন নয়। দেশের অন্তঃস্থলে যতই এরা পিছিয়ে যাচ্ছে এদের শক্তি এতটুকুও কমছে না, আসলে তা বেড়েই চলেছে। জার্মান ফ্রণ্টের পিছনের এলাকাকে কিছুতেই বিজিত বা আত্মসমর্পিত বলা চলে না। এক হিসেবে রাষ্ট্রের সেই বিরাট এলাকাও একটা যুদ্ধক্ষেত্র, কারণ এর প্রতিটি অঞ্চলে কখনো খোলাখুলি কখনো বা গোপনে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলেছে। সবসময়েই এই সংঘর্ষ অসাধারণ তীব্র ও একরোখা। বেষ্টনী ভেঙ্গে বেরিয়ে-আসা সোভিয়েত সেনাদল লড়াই চালাচ্ছে, হাজারে হাজার ছোট ছোট দল শত্রুর পশ্চাদ্ভাগ ভেদ করে লড়াই করছে। এর মধ্যেই বেলোরুশিয়ার গভীর জঙ্গল ও অভেদ্য জলাভূমিতে একটা ভয়ঙ্কর ও অবিনাশী সৈন্যদল গড়ে উঠেছে। এই শক্তি হামলাদারের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠেছিল — এ হল কমিউনিস্ট

পার্টির গুপ্ত সংঘ দ্বারা পরিচালিত দেশব্যাপী পার্টিজান আন্দোলন।

হামলাদাররা যেখানেই এগুচ্ছে সেখানেই একটা ফ্রণ্ট গড়ে উঠছে। এই ফ্রণ্ট শত শত মাইল গভীর, নাজি বাহিনীর অগ্রগামী টহলদারী সৈন্যদের কাছ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের একেবারে সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। জার্মান আক্রমণের যে প্রবল ঢেউ ২২শে জুন সোভিয়েত সীমান্তের ওপর ভেঙে পড়ে তা এই অদৃশ্য সীমারেখাকে পরাস্ত করতে পারেনি। জার্মান ট্যাঙ্কের ট্র্যাক বা লক্ষ লক্ষ সৈনিকের বুট এই সীমারেখাকে লোপাট করতে সমর্থ হয়নি। সীমান্ত বরাবর সর্বত্র ঘেরা-পড়া সীমানারক্ষী, সৈন্যদল, চৌকির সৈন্য ও বিক্ষিপ্ত সীমান্তস্থলের সামরিক ঘাঁটির গ্যারিসন লড়াই চালাতে থাকে। ব্রেস্ত এলাকায় এই সব প্রতিরোধ কেন্দ্রকে শত্রু বিধ্বস্ত করার আগে কয়েকদিন ধরে সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলে মরিয়া এবং অসম যুদ্ধ চলে।

কিন্তু এর পরেও পশ্চিম বুগের তীরে একটি জায়গায় এমন দুর্ধর্ষ লড়াই চলে যা অশ্রুতপূর্ব হিংস্র ধরনের। এখানে মুষ্টিমেয় সোভিয়েত সৈন্যের উপর চারদিক থেকে গুলি চলতে থাকে, শত্রু এদের ঘেরাও করে—সংখ্যায় তারা দশ প্রতি এক। এমন দৃঢ়তা ও বীর্য নিয়ে এরা আমাদের মাতৃভূমির প্রথম কয়েক গজ মাটি রক্ষা করে যার কথা এমনকি শত্রুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

জার্মান ট্যাঙ্ক যখন মিন্‌স্কে ঢোকে তখনও এরা লড়াই চালিয়ে যায়। ফ্রণ্ট যখন বেরেজিনায় সরে আসে তখনও এরা

আত্মসমর্পণের সর্ত সগর্বে প্রত্যাখ্যান করে। অবিশ্বাস্য হলেও যুদ্ধের পুরো এক মাস বাদে যখন জার্মান অগ্রবর্তী দল স্মলেন্স্ক পেরিয়ে যায় তখনো ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর রক্ত-ক্ষয়ী অবস্থায় সংগ্রামরত শেষ সোভিয়েত মানুষ কয়টি অস্ত্র না ছেড়ে, চালাতে থাকে সেই বিস্ময়কর ও অভূতপূর্ব লড়াই।

কাহিনী-সদৃশ এই বীরের দল দেশরক্ষার সেই মহান যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরবময় প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখে যায়। এরা সেই ক্ষুদ্র সোভিয়েত গ্যারিসনের অফিসার ও সৈন্য যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের একেবারে সীমান্তে অবস্থিত ব্রেস্ত সহরের কাছে পুরোনো এক রুশ কেল্লায় ১৯৪১এর ২২শে জুন তারিখে পাহারা দিচ্ছিল।

প্রাচীন কেল্লা

যেখানে ছোট মুখাভেৎস্ নদী বয়ে চলেছে পশ্চিম বুগে সেখানে বার্চ-ঢাকা টীলাগুলোতে প্রাচীন কালে বেরেস্তিয়ে নামে একটি স্লাভ বসতি গড়ে ওঠে। পরে এই বসতি কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ এক সুরক্ষিত সহর হয়ে দাঁড়ায়। এটা প্রথমে ছিল লিথুয়ানিয়ার অধীনে পরে পোল্যান্ডের, তাই এর নাম হয় ব্রেস্ত বা ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক।

এই দুর্গ-সহরটি পাশাপাশি অবস্থিত তিনটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের যথা রাশিয়া, পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে ক্রমাগত

লড়াইয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই হল ব্রেস্তের ইতিহাস। বহুবার বিদেশী আক্রমণকারী এর উপর চড়াও হয়েছে, একাধিকবার সহরটিকে লুটপাট ও ধ্বংস করেছে, আক্রমণে প্রাণ দিয়েছে এর নাগরিকরা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে আবার এটা ফিরে আসে রাশিয়ার অধীনে। ১৮৯২ সালের লড়াইয়ের পর জার সরকার স্থির করে রাষ্ট্রের পশ্চিম অঞ্চলে ব্রেস্তকে রুশ সৈন্যবাহিনীর একটি শক্তিশালী কেল্লা বানাবে। তাই এক শতাব্দীরও আগে মুখাভেৎস্ ও বুগের সঙ্গমস্থলে ব্রেস্ত কেল্লার উদ্ভব।

সুনিপুণভাবে তরাই অঞ্চলের সুযোগ নিয়ে রুশ সামরিক ইঞ্জিনিয়াররা এমন একটি দুর্গ বানায় যা সে সময় সত্যিই ছিল দুর্ভেদ্য। এই দুর্গ অঞ্চলের চারপাশে ত্রিশ ফুটের উপর চওড়া মাটির বাঁধ, পরিধি প্রায় চার মাইল। এই চওড়া পাঁচিলের ভিতর এমন ভাঁড়ার ঘর বানান হয় যেখানে একটা পুরো বাহিনীর মত পর্যাপ্ত খাবারদাবার রাখা সম্ভব। মাটির বাঁধ যেখানে নদীর পার বরাবর নয় সেখানে পরিখা কেটে তার ভেতর বুগ ও মুখাভেৎসের জল আনা হয়। নদীর স্বাভাবিক খালের সঙ্গে মিলে এই পরিখাগুলি চারটি দ্বীপ বানায়, চারটি সুরক্ষিত জায়গা। এগুলি একসঙ্গে মিলে ব্রেস্ত কেল্লার সৃষ্টি।

বুগের সঙ্গে মিশবার ঠিক আগে পশ্চিমমুখী মুখাভেৎস্ দুটি খালে বিভক্ত হয়ে গেছে। দুর্গ এলাকার মাঝখানে যে ছোটো দ্বীপ তার উত্তর ও দক্ষিণে এই দুটি খাল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে স্বয়ং বুগ। এইটেই ব্রেস্তের কেন্দ্রস্থল।

দুর্গের অন্য তিনটি বহির্ভাগের মত এটা মাটির দেয়াল দিয়ে ঘেরা নয়। এটা ঘেরা একটানা দো-তলা সমান উঁচু গাঢ় লাল রঙের ইটের গাঁথনি দিয়ে। এই গাঁথনির মধ্যেই দুর্গের ব্যারাকগুলি ঘন বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে, তখন এর নাম ছিল 'রণ্ডো' বা চক্র।

এই ব্যারাক বাড়ির পাঁচশ ঘরের ভিতর বার হাজার সৈনিকের একটি গ্যারিসন এবং সেই সঙ্গে এদের উপযুক্ত দীর্ঘ দিনের উপযোগী খাবারদাবার ও সামরিক সাজসরঞ্জাম থাকতে পারত। তা ছাড়া ব্যারাকের নীচে ছিল চওড়া সেলার আর সেই সেলারগুলির নীচে মাটির তলা দিয়ে যাতায়াতের বিস্তৃত ব্যবস্থা।

ব্যারাকের প্রাচীর প্রায় পাঁচ ফুট পুরু। এটা বড় ধরনের গোলার আঘাত সামলাতে পারত। এই প্রাচীরের দ্বারা সুরক্ষিত রাইফেলধারীরা প্রায় নিরাপদে সরু ছেঁদার ভিতর দিয়ে এগিয়ে-আসা শত্রুর উপর পারত গুলি চালাতে। প্রাচীরের বাইরের দিকে এখানে ওখানে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ। এতেও ছিল অনুরূপ ছিদ্র যা দিয়ে হামলাদারের উপর পাশের দিক থেকে গুলি ছোড়া যায়। বৃত্তাকার বাড়িটির দক্ষিণ অংশে তেরেস্পল্ ও খোল্ম্ গেট এবং উত্তরাংশে বিরাট ত্রিখিলান গেট গভীর সুড়ঙ্গের দ্বারা ব্যারাকের ভিতরকার প্রাঙ্গণের সঙ্গে পুলগুলোর যোগাযোগ করে। এই পুলগুলো অপর তিনটি সুরক্ষিত অংশের ভিতরকার পথ।

এই তিনটি সুরক্ষিত অংশ কেন্দ্রীয় অংশকে সবদিক থেকে ঢেকে রাখত। এই দুই অংশের নাম তথাকথিত দক্ষিণ ও

পশ্চিম দ্বীপ। সর্ববৃহৎ সুরক্ষিত অংশটি দুর্গ এলাকার প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে, উত্তরের দিক থেকে কেন্দ্রীয় দ্বীপটিকে আড়াল করেছিল বিরাটাকৃতি ঘোড়ার নালের মত। এর দুই প্রান্ত গিয়ে মিশেছে বুগ ও মুখাভেৎসে।

দুর্গের কেন্দ্রস্থল সবদিক থেকে সুরক্ষিত। ব্যারাকের কাছে আসার আগে শত্রুকে নিদেনপক্ষে দুর্গের কেন্দ্রস্থলের বহির্দেশস্থ তিনটি কেল্লার অন্তত একটিকে দখল করতে হত। এর প্রতিটির চারপাশে মাটির বাঁধ আর জল, গম্বুজ ও রাভেলিন, সৈন্য আর কামানের জন্য শক্তিশালী প্রাকার, কেল্লার নীচে খাবারদাবার ও গোলাবারুদ। এরা নিজেরাই এক একটি আলাদা দুর্গ।

১৮৪২এ নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং ব্রেস্ত দুর্গের উপর বিজয়গর্বে উড়তে থাকে রুশ সামরিক পতাকা। তখন একথা নিশ্চিন্তে বলা চলত যে বাস্তবিকই এটি পশ্চিম বুগ নদীর পারে এক সুরক্ষিত স্থান, আধুনিক যুগের উপযোগী সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গের অন্যতম। একমাত্র প্রশ্ন ছিল কতদিন এটা এ অবস্থায় থাকবে।

আগেকার দিনে যখন লড়াই চালাত অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট সৈন্যবাহিনী, এ ধরনের দুর্গ যুদ্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শক্তিশালী গ্যারিসনসহ কোন দুর্গ পুরো একটা সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি রুখতে পারত, কারণ শত্রু পিছন দিক থেকে ঐ গ্যারিসনের আক্রমণের ভয়ে দুর্গ পেরুতে সাহস পেত না। হয় তারা বাধ্য হত দুর্গ দখলের জন্য দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য লড়াই চালাতে, কিংবা উক্ত গ্যারিসনের সম্ভাব্য কার্যকলাপকে

সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সৈন্যবাহিনীর বড় এক অংশকে সেই দিকে সমাবেশ করতে। কখনো বা সমস্ত লড়াইটার লক্ষ্য থাকত কেবল কয়েকটি দুর্গ দখল করা।

সাধারণভাবে সমরবিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গনির্মাণ কৌশলেরও উন্নতি হয়। কামান ও গোলাবারুদের উন্নতির দ্বারা দুর্গনির্মাণ কৌশল বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে কামান শুধু দুর্গ ধ্বংসই করত তা নয়, বলতে গেলে এক দিক থেকে দুর্গ সৃষ্টিও করত।

গোলন্দাজ সামরিক ইঞ্জিনিয়ারের কাছে পরিষ্কারভাবে তাদের দাবী জানাত। গোলার আকৃতি ও তার অনুপ্রবেশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করত প্রাচীরের ঘনত্ব ও দুর্গনির্মাণের অন্যান্য বিষয়গুলি। দুর্গ এলাকার পরিধি ঠিক করার ব্যাপারে কামানের পাল্লা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গোলার পাল্লা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের কেন্দ্রস্থলের বহির্দেশস্থ কেল্লাকে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া হল যাতে শত্রুর গোলাবর্ষণের হাত থেকে কেল্লার কেন্দ্রস্থলটিকে রক্ষা করা যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কামান সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের ইতিহাস হয়ে ওঠে গোলন্দাজির বিরুদ্ধে তার লড়াইয়ের ইতিহাস।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রেস্তের এই নূতন কেল্লাটিতে তখনকার দিনে সমরবিজ্ঞানের দিক থেকে প্রয়োজনীয় সবকিছুই ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েকবছর বাদে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ ও সেভাস্তোপলের প্রতিরোধ পরিষ্কার প্রমাণ করে দেয় যে সমরবিজ্ঞান এগিয়ে গেছে, তখনকার দুর্গের কোনটিকেই

যথেষ্ট আধুনিক মনে করা যায় না। অল্প কিছুদিন বাদেই কামান ও গোলাবারুদের বাস্তবিকই যে আমূল পরিবর্তন ঘটে তার ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলে এই দুর্গের উপর।

আগেকার মসৃণ নলওলা কামান ছাড়াও দেখা দেয় রাইফ্‌লিং করা নলওলা নূতন কামান। এর ফলে সুনির্দিষ্টভাবে কামানের পাল্লা ও টিপের নির্ভুলতা বৃদ্ধি পায়। তখন প্রতিটি দুর্গের এমনকি ভিতরের অংশও কামানের পাল্লার মধ্যে এসে পড়ে। কারণ বাইরের প্রাকারের কাছাকাছি আসামাত্র শত্রু কেল্লার কেন্দ্রীয় অংশেও সহজেই গোলা দাগতে পারে।

এই সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্য সামরিক ইঞ্জিনিয়াররা মাথা খাটাতে থাকে। দুর্গ তৈরীর সমস্যা সমাধানে দেরী লাগল না। বর্তমান কেল্লাগুলিকে দুর্গচক্রে ঘিরে ফেলা হল। কেল্লার বহির্প্রাচীরের কয়েক মাইল দূরে গড়া হল এই দুর্গগুলিকে এবং এদের প্রত্যেকটির ভিতর রাখা হল কামান ও একটি করে গ্যারিসন। এই ভাবে নূতন তৈরী প্রতিরোধ বেষ্টনী প্রধান কেল্লা থেকে শত্রুকে দূরে ঠেকিয়ে রাখত। কামান দাগার হাত থেকে এই ভাবে রক্ষা পেত কেন্দ্রীয় কেল্লা।

ইতিমধ্যে রাইফ্‌লিং করা নলওলা কামানের ক্রমশ উন্নতি ঘটতে থাকে। কামানের পাল্লা যায় বেড়ে। এমন সময় দুর্গচক্র সত্ত্বেও প্রধান কেল্লা আবার এসে গেল কামানের পাল্লায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আরও এগিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় রইল না। প্রথম দুর্গচক্রের কয়েক মাইল দূরে একইভাবে



কেন্দ্রীয় দুর্গের খোল্‌ম্‌ গেট

দ্বিতীয় দুর্গবেষ্টনী বানান হল। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল এর ফল দীর্ঘস্থায়ী হবে না। প্রত্যেকবার কামানের পাল্লা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যা অবধারিতভাবে আবার দেখা দেবে, কিন্তু সে সময় দেখা দিল আর এক পরিস্থিতি। এতে কেল্লার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল চিরদিনের মত।

সাম্রাজ্যবাদী যুগে সামরিক অভিযানের রঙ্গভূমিতে হাজির হল লক্ষ লক্ষ সৈন্য। পুরোনো সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এর কোন তুলনাই চলে না, এমনকি নেপোলিয়ান কর্তৃক ১৮১২ সালে মস্কোর বিরুদ্ধে পরিচালিত তথাকথিত 'গ্র্যান্ড আর্মি'রও নয়। এই বিরাট নতুন সৈন্যবাহিনীর আবির্ভাবের পর কেল্লাসমূহের সামরিক গুরুত্ব একেবারে লোপ পেল। এগিয়ে আসা এই বিরাট সৈন্য-সংখ্যার বিরুদ্ধে এরা সত্যিকারের কোন বাধাই দিতে পারল না। হামলাদার সৈন্য চলার পথে কেল্লাকে স্রেফ পাশ কাটিয়ে যেত। সামান্য সৈন্য রেখে যেত কেল্লা দমন করতে। শত্রুর অগ্রগমনে বাধা ত দিতেই পারল না, কেল্লাগুলি প্রতিরোধী পক্ষের এক দায় হয়ে দাঁড়াল। দুর্গবাহিনী পোষার ফলে ফ্রন্টের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিতে দক্ষ সৈন্যচালনায় বাধা জন্মাল, সৈন্যবাহিনীও বিক্ষিপ্ত হল অর্থহীনভাবে। আর এরই সঙ্গে যদি কামান থেকে গোলাবর্ষণের অপরিমিত ক্ষমতা এবং বিমানের মত নূতন ও শক্তিশালী অস্ত্রের কথা চিন্তা করা যায় তাহলে দুর্গের যে আর কোনই গুরুত্ব নেই তাতে সন্দেহ থাকে না। এদের প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রেস্ত কেল্লার চারপাশে ত্বরিৎগতিতে দ্বিতীয় দুর্গচক্র গড়া হয়। পশ্চিম ফ্রন্টে কয়েক মাস লড়াইয়ের পরই রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ চটপট বুঝতে পারে যে পুনর্গঠন করেও কেল্লাগুলি সামলান যাবে না। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের লিয়েজ, নামুর ও মানবেজের মত সর্বাধুনিক ও শক্তিশালী



কেন্দ্রীয় দুর্গের তেরেস্পল্ গেটের ধ্বংসাবশেষ

দুর্গও জার্মান সৈন্যের অগ্রগমনকে রুখতে পারেনি। কয়েকদিনের মধ্যেই একটার পর একটার পতন ঘটে।

এটা শিক্ষামূলক। পশ্চিম ফ্রণ্টের লড়াই থেকে রুশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সাবধান হয়। ব্রেস্ত কেল্লার কাজ বন্ধ করে সব অস্ত্রশস্ত্রসহ এর সমগ্র গ্যারিসন পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফ্রণ্টে। কেল্লায় থাকে শুধু রসদ। ফ্রণ্ট-গামী রিজার্ভ ডিভিসনের এটা জমায়েতের জায়গা হয়ে ওঠে। ১৯১৫ সালের গ্রীষ্মে জার্মানরা যখন পূব ফ্রণ্টে আক্রমণ চালিয়ে ব্রেস্তে ঢোকার রাস্তায় হাজির হয়, রসদের বেশীর ভাগ তখন সরিয়ে ফেলা হয় কেল্লা থেকে। দুর্গরক্ষী সেনাদের আদেশ দেওয়া হয় কতকগুলি গড়কে উড়িয়ে শত্রুকে বাধা না দিয়ে দুর্গটিকে তাদের হাতে ফেলে

সরে আসতে। সেই থেকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা থাকে জার্মানদেরই হাতে। ১৯১৮তে এই দুর্গেই তরুণ সোভিয়েত রিপাবলিকের উপর কঠোর সর্ত চাপিয়ে ব্রেস্ত শান্তি চুক্তি সই হয়।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পর বেলোরুশিয়ার পশ্চিম অঞ্চল পুঁজিবাদী পোল্যান্ডের হাতে যায়। বিশ বছর ধরে কেল্লা থাকে এরই অধীনে। তারপর ১৯৩৯ সালে পশ্চিম বেলোরুশিয়া বেলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রিপাবলিকে নিজের ন্যায্য স্থান দখল করে।

সোভিয়েত সৈন্য ঢোকে ব্রেস্ত কেল্লায়। বর্তমান যুগে অবশ্য পুরোনো কেল্লাটির বিশেষ কোন সামরিক গুরুত্ব নেই। আধুনিক কামান ও বিমানের কাছে এর প্রাচীর অর্থহীন। ব্যারাক আর গুদামঘর অবশ্য সৈন্যদল ও প্রয়োজনীয় রসদের পক্ষে বেশ উপযোগী। পশ্চিম বুগের তীরে সোভিয়েত সৈন্যরা যে শক্তিশালী ব্রেস্ত রক্ষাঘাঁটি গড়তে থাকে কেল্লাসংলগ্ন পুনঃসজ্জিত দুর্গগুলি তারই অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

১৯৪১এর বসন্তে সোভিয়েত বাহিনীর দুটি পদাতিক ডিভিসন ব্রেস্ত দুর্গে ছিল। তারা অবিচল, সুশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ। দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য মার্চ, গুলি ছোড়া এবং নিয়মিত সামরিক শিক্ষা ও যুদ্ধকৌশলের মাধ্যমে তাদের সামরিক নৈপুণ্য বৃদ্ধি পায়।

এদেরই একটি ডিভিসনের নাম 'ষষ্ঠ ওরিওল লাল পতাকা ডিভিসন'। এর ইতিহাস দীর্ঘদিনের এবং গৌরবময়।

গৃহযুদ্ধের সময় এর সৃষ্টি। পস্কভ অঞ্চলে জার্মান অনুপ্রবেশকারী সৈন্যের সঙ্গে স্মরণীয় সংগ্রামে এর অগ্নি-দীক্ষা। এরপর দক্ষিণ রাশিয়ায় দেনিকিনের পরাজয়ে অংশ নেয় এরা। এর রেজিমেণ্টের অফিসার ও সৈন্যেরা বংশ পরম্পরা ধরে চলে-আসা একটি কাহিনীকে সযত্নে স্মরণে রেখেছে। ডিভিসনটি প্রথম সৃষ্টির পর যখন ফ্রণ্টের দিকে রওনা হয় লেনিন নিজে স্টেশনে আসেন এদের সঙ্গে দেখা করতে এবং যাত্রিক ডিভিসনের সামনে ভাষণ দেন।

অপরটি ৪২ নং পদাতিক ডিভিসন। ফিন অভিযানের সময় ১৯৪০এ এর সৃষ্টি। এর মধ্যেই ম্যানারহাইম লাইনে এরা ভাল লড়াই দেখিয়েছে। ডিভিসনের বহু অফিসার ও সৈন্যকে বীরত্বের জন্য সম্মানচিহ্ন দেওয়া হয়। এদের সর্বশ্রেষ্ঠ দল হল ৪৪ নং পদাতিক রেজিমেণ্ট, অধিনায়ক মেজর পিওতর গাভ্রিলভ। সে সম্প্রতি ফ্রুঞ্জে সমর আকাদেমি থেকে স্নাতক হয়েছে। ১৯১৮ সালে মেজর গাভ্রিলভ স্বেচ্ছায় লাল ফৌজে যোগ দেয়, অংশ নেয় গৃহযুদ্ধে। প্রায় বিশ বৎসর ধরে সে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। সংগঠনের দারুণ ক্ষমতা, অসাধারণ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অধিনায়ক হিসেবে কঠোর ও কাজ আদায়কারী। একান্ত অধ্যবসায় ও নৈপুণ্য নিয়ে সে তার লোকদের শিক্ষা দেয়। পরে সে ব্রেস্ত কেল্লার দুঃসাহসিক প্রতিরোধ সংগঠনে বিশিষ্ট অংশ নেয়।

বসন্তে কেল্লাটিকে প্রচুর সৈন্যে ভরাট করা হলেও ১৯৪১এর গ্রীষ্মের প্রথম দিকে উভয় ডিভিসনের রেজিমেণ্ট

এবং গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক ইউনিটকে নিকটবর্তী নানা শিক্ষা শিবিরে পাঠানো হয়। যথারীতি গ্রীষ্মকালীন শিক্ষা সুরু হয়। পশ্চিম বুগের সীমান্ত অঞ্চলের রক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হতে থাকে। কেবলমাত্র হেডকোয়ার্টারগুলো এবং রেজিমেণ্টের পাহারাদার সৈন্যের দু'একটি কোম্পানি থাকে কেল্লায়।

সুতরাং ১৯৪১এর ২২শে জুন রাতে যখন যুদ্ধ শুরু হল, ব্রেস্ত কেল্লায় ছিল দুটি পদাতিক রেজিমেণ্টের চাইতেও কমসংখ্যক সৈন্য। যদি এ কথা ধরা যায় যে এরা ছিল কেন্দ্রীয় সংগঠন ছাড়া বিভিন্ন ইউনিটের ছোট ছোট দলে দুর্গ অঞ্চলে ছড়ান তাহলে বুঝতে দেরী হয় না এ অবস্থায় কেল্লার রক্ষা সমস্যা কত জটিল ছিল। কামান ও ট্যাঙ্কের মাত্র সামান্য সংখ্যা ছিল কেল্লায়। এর উপর আবার কতকগুলো ট্যাঙ্ক ও কামান খুলে রাখা হয়েছিল। পরের দিন সকাল পর্যন্ত সেই অবস্থাতেই সেগুলি ছিল। সেই সকালে সেগুলিকে পরীক্ষা করার কথা।

কেল্লায় কি পরিমাণ গ্যারিসন আছে সে খবর জার্মান কর্তৃপক্ষের জানা ছিল। ৪র্থ জার্মান সৈন্যবাহিনীর পরিচালক ফিল্ড-মার্শাল ফন ক্লুগে তার বাহিনী নিয়ে এল ব্রেস্তে, আশা ছিল কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেল্লা ফতে করবে। জয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার জন্য সে স্থির করল এই অঞ্চলে খুব বেশী লোক লাগাবে। জেনারেল শ্রোটের অধীনে যে সৈন্যবাহিনীর কোর্ ব্রেস্ত কেল্লার উল্টোদিকের ফ্রণ্টে পাঠান হল তাদের মধ্যে ছিল তিনটি সুস্থ ও বলপুষ্ট পদাতিক

ডিভিসন। এর একটির নাম ৪৫ নং পদাতিক ডিভিসন। এরাই সর্বপ্রথম ওয়ারস'র জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষের ভিতর ঢোকে এবং বিজিত প্যারিসের মধ্য দিয়ে বিজয়গর্বে মার্চ করে যায়। জার্মানি সেনাবাহিনীতে দুর্ধর্ষ দল হিসেবে এদের খ্যাতি ছিল। একাধিকবার স্বয়ং হিটলারের কাছ থেকে এরা প্রশংসা পেয়েছে। ব্রেস্ত কেল্লার উপর এখন চরম আঘাত হানার কথা এই দলটিরই।

শ্রোটের সমগ্র গোলন্দাজ বাহিনী এবং তার আনুষঙ্গিক গোলন্দাজ ও মর্টার দলকে আনা হল কেল্লার কাছে এবং লুকিয়ে রাখা হল বুগের বাঁ তীরে ঘন ঝোপের মধ্যে। জার্মান জেনারেলরা প্রায় নিশ্চিতই ভেবেছিল যে এই অপ্রত্যাশিত ও শক্তিশালী কামানের গোলাবর্ষণ এবং তার সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ বিমান হানায় দুর্গ গ্যারিসনের মানসিক বল ভেঙে যাবে। গোলাবর্ষণের পর পদাতিক বাহিনীর কাজ হবে কেবল কোন একদল হতচকিত ও ভগ্নোৎসাহ রুশ সৈন্যকে বন্দী করা।

একে শত্রুর সংখ্যাধিক্য এক প্রতি দশ, তাতে আবার রাত্রিবেলার আচম্বিত আক্রমণে ফলাফলটা হয়ে ওঠে তীব্রতর।

বহুবছর ধরে জার্মান সমরবিদরা ত্বরিত যুদ্ধ নিয়ে জুয়া খেলেছে, একটিমাত্র চরম আঘাত হেনে তথাকথিত 'একাঙ্ক জয়' অর্জন। ক্লাউজেভিৎস, মোল্ট্কে, শলীফেনের মত সমস্ত জার্মান সমরনীতির ধুরন্ধররা এ ধরনের ত্বরিত যুদ্ধের স্বপ্ন দেখে এসেছে, ভাবী শত্রুকে 'মুহূর্তের মধ্যে' পরাজিত করার ভিত্তিতে জার্মান জেনারেলরা বহুবছর ধরে ছক কষেছে। তা ছাড়া সবচেয়ে বেশী

জোর দেওয়া হয় আকস্মিক আক্রমণের উপর। জার্মান সমর তাত্ত্বিকদের মতে যুদ্ধে দ্রুত জয়লাভ করার মূলমন্ত্র এইটি।

হিটলারের জেনারেলরা হামলাদারী জার্মান সমর তাত্ত্বিকদের সরাসরি উত্তরসাধক এবং তাদের একনিষ্ঠ অনুসারক। 'ব্লিৎস ক্রিগ্' অর্থাৎ ত্বরিত যুদ্ধের তত্ত্বই তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের মূল আর এর উপর ভিত্তি করেই পররাজ্য গ্রাস করার যাবতীয় ছক কষা। তারা এ নিয়ে ঘরের নিরালা কোণে বসে শুধু পড়াশুনাই করেনি, ইউরোপের যুদ্ধক্ষেত্রেও একে প্রয়োগ করেছে।

'বারবারোশা পরিকল্পনা'ও ত্বরিত যুদ্ধেরই পরিকল্পনা, এর প্রধান বৈশিষ্ট্য আকস্মিক আক্রমণ। হিটলারের জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সই করে, সোভিয়েত জনগণকে শান্তির আশ্বাস দিয়ে ধোঁকা দেয় আর সেই অবসরে সম্পূর্ণ গোপনে বিশ্বাসঘাতক আক্রমণের প্রস্তুতি চালায়। আকস্মিক হানা দেওয়ার যে উদ্দেশ্য, তাতে শত্রু বহুল পরিমাণে সফল হয়।

প্রধানত রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পদাতিক ডিভিসন চুপচাপ এগিয়ে আসে সীমান্তের কাছে। ডালপালা দিয়ে সযত্নে চাপা দেওয়া কামান আর ট্যাঙ্কও যথাস্থানে নিয়ে আসা হয় রাতের বেলা। সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত জেলাগুলিতে হিটলারের গুপ্তচররা আরও বেশী তৎপর হয়ে ওঠে, গোয়েন্দা ও অন্তর্ঘাতককে ঘন ঘন পাঠান হয় সীমান্তের ওপারে।

ব্রেস্ত অঞ্চলে নাজি গুপ্তচর বিশেষভাবে তৎপর হয়ে ওঠে।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগে সোভিয়েত সীমান্তরক্ষীরা এই অঞ্চলে প্রায়ই গুপ্তচর ও অন্তর্ঘাতকদের পাকড়াও করতে থাকে। ২১শে জুন সন্ধ্যায় জার্মান অন্তর্ঘাতকরা সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসারের ছদ্মবেশে সহরে, এমনকি কেল্লায় ঢোকে। সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে সেই অনুসারে এদের কয়েকজন নাকি সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে জার্মান রপ্তানিদ্রব্যে ভরা মালগাড়ীতে। রাতের বেলা এই অন্তর্ঘাতকরা বৈদ্যুতিক তার, সহরে ও কেল্লায় টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কেটে দেয় আর লড়াই সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সৈন্যের পিছনে আক্রমণ চালায়।

শত্রু গোপনে অভিযান চালালেও তাদের গতিবিধি যে একেবারে ধরা পড়েনি তা নয়। সোভিয়েত গোয়েন্দা বিভাগ সীমান্তের কাছে জার্মান সৈন্যের জমায়েত হবার রিপোর্ট পাঠায়। সতর্ক পাহারাদার সোভিয়েত সীমান্তরক্ষীরা খবর দেয় প্রতি রাতে গা-ঢাকা দেওয়া জার্মান কামান বাঁ তীরের ঝোপে ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় হাজির হচ্ছে।

অন্যান্য সূত্রেও আতঙ্ক উদ্রেককারী এই সব কার্যকলাপের খবর আসতে লাগল। পোলীয় গ্রামের লোকেরা বুগের অন্য পারে সোভিয়েত সীমান্তে জার্মান সৈন্যের জমায়েতের উপর কড়া নজর রাখল। কখনো কখনো জার্মান অফিসার ও সৈন্যরা পোলীয়দের কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণের কথা বলত খোলাখুলি। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত বন্ধু স্থানীয় লোকেরা উদ্বেগের সঙ্গে ভাবতে লাগল কী করে

আসন্ন লড়াইয়ের কথা সোভিয়েত কর্তৃপক্ষকে জানান যায়। বহু সময় পোলীয় কৃষকরা প্রাণের মায়া না করে সাঁতার কেটে বুগ পেরুত নাজি নেতাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সীমান্তরক্ষীদের সতর্ক করে দিতে।

এ সব খবরই সঙ্গে সঙ্গে পাঠান হত মস্কোতে এবং ব্যক্তিগতভাবে জানান হত বেরিয়াকে। বেরিয়া তখন ছিল আভ্যন্তরীণ বিষয়ের গণ কমিশার। কিন্তু এই উদ্বেগময় সংবাদের জবাবে কেবলমাত্র সেই বাঁধা ধরা জবাব আসত 'সতর্ক নজর বাড়াও'।

প্রথম শক্তিশালী আঘাতের আকস্মিকতা, সংখ্যাধিক্য ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রাধান্য, জার্মান সৈন্যরা যে ইতিমধ্যেই যুদ্ধে দড় ও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত, এ সবকিছুই হিটলারী সৈন্যবাহিনীর প্রচুর সুবিধে করে দিয়েছিল। এমন সুবিধে যে অন্য কোন রাষ্ট্র হলে নিশ্চয় এরা চূড়ান্ত জয় লাভ করত। পূর্বাঞ্চল অভিযানে নাজি সৈন্য প্রথম দিকটায় সফল হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঐ সব সুবিধে সত্ত্বেও তারা কিন্তু জয়ী হতে পারেনি।

১৯৪১এর গ্রীষ্মে ব্রেস্ত দুর্গে যা ঘটেছিল তা রুশ জার্মান ফ্রণ্টে আসুরিক সংগ্রামের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। তবু এই ঘটনাটি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যময়। সোভিয়েত জনগণের ক্রোধের যে প্রচণ্ড শক্তি এ হল তারই সত্যিকার প্রতিরূপ। এই ক্রোধই একদিন টগবগিয়ে উঠে হিটলারত্বের দুষ্ট শক্তিকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করে। ব্রেস্ত কেল্লার সংগ্রাম শত্রুকে বহু বিষয়ে ভাবিয়ে তোলে।

ফ্রন্টের এই ক্ষুদ্র অঞ্চলে নাজি সৈন্যরা তাদের সুবিধের পূর্ণ সুযোগ নিতে পারত। শত্রুর সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রাধান্য ছিল খুবই বেশী। তা সত্ত্বেও যে 'ত্বরিত' সাফল্য আশা করেছিল তা ওরা পেল না। শত্রুকে ক্ষুদ্র সাফল্যের জন্যও দাম দিতে হল অনেকখানি। মুষ্টিমেয় সোভিয়েত সৈন্য ব্রেস্ত দুর্গের জন্য, তাদের দেশের মাটির প্রথম কয়েক গজের জন্য বীরের মত সংগ্রাম করে কী ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে শত্রুকে কঠোরভাবে সতর্ক করে দিল। এই পুরোনো রুশ কেল্লার সাংঘাতিক লড়াইয়ের আগুন আর ধোঁয়ার মাঝখানে যে কোন দূরদর্শী দর্শকই দেখতে পেত আগামী শীতে মস্কোর কাছে নাজি বাহিনীর পরাজয়, স্তালিনগ্রাদে তাদের ভবিষ্যৎ বিপর্যয় এবং পরান্ত বার্লিন রাইখস্টাগের উপর জয়ের উড্ডীন পতাকা।

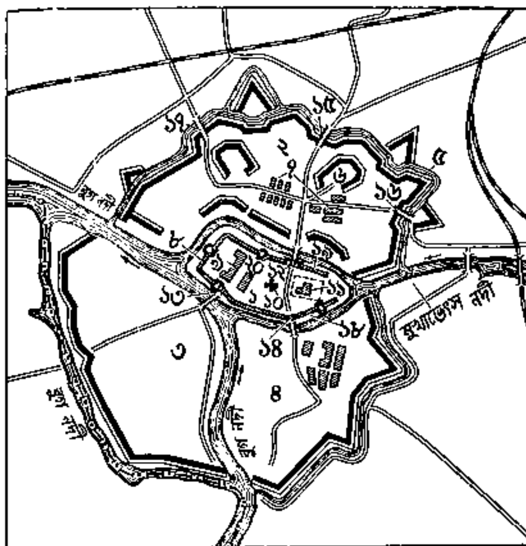
আক্রমণের আরম্ভ

শান্তিতে ঘুমোচ্ছে ব্রেস্ত কেল্লা, এমন সময় বুগের উপর গর্জে উঠল জার্মান গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম কামান। কেবলমাত্র নদীতীরবর্তী ঝোপের মাঝখানে অগ্রবর্তী রক্ষীদল আর দুর্গ প্রাঙ্গণের সান্ত্রীরা দেখল পশ্চিম দিগন্ত রাঙিয়ে তোলা তীব্র ঝলক, শুনতে পেল ক্রমবর্ধমান ভয়ংকর আওয়াজ। পরমুহূর্তেই শত শত গোলা ফাটতে লাগল আর কেঁপে উঠল মাটি।

এ বড় সাংঘাতিক জাগরণ। সেদিন সন্ধ্যায় লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল শান্তিতে এই কথা ভাবতে ভাবতে পরের দিন ওরা উপভোগ করবে রবিবারের ছুটি। কত আমোদ আহ্লাদ, যথারীতি ফুটবল খেলা, ক্লাবে নাচ, সহরে বেড়াতে যাওয়া। হঠাৎ ওরা জেগে দেখল আগুন আর মৃত্যু। ভাল করে জাগার আগে, কী ঘটছে ভাল করে বোঝবার আগে প্রথম কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে বহু লোক মারা পড়ল।

সমস্ত কেল্লা ঢেকে গেল ধোঁয়া আর ধূলোর ঘন মেঘে, বিস্ফোরণের ঝলকে ঝলসে উঠল গাঢ় নীল রঙে। জ্বলতে জ্বলতে ভেঙে পড়ল বাড়িঘর, মানুষ পিষে পুড়ে মরল। কেল্লার উত্তর দিকে অফিসারদের কোয়ার্টার থেকে আর 'কেন্দ্রীয় দ্বীপের' সীমান্ত কম্যান্ডাণ্ট অফিসের চারপাশে আতঙ্কিত অর্ধ-নগ্ন নারী সন্তান কোলে এদিক ওদিক ছুটতে ছুটতে লুটিয়ে পড়ল গোলার টুকরোয়। ব্যারাকে রক্ত-মাখা তক্তার ওপর আহত সৈন্যরা গোঙাতে লাগল। নিরস্ত্র বা সশস্ত্র সৈন্যরা ক্রমবর্ধমান কামানের গোলা আর আকাশ বোমার হাত থেকে বাঁচার জন্য ছুটে গেল মাটির নীচের কুঠরীতে।

প্রথম কয়েক মিনিটে যে অপরিহার্য বিভ্রান্তি দেখা দিল তা আরও বেড়ে গেল এই কারণে যে বেশীর ভাগ অফিসারই শনিবারে রাত কাটাত দুর্গের বাইরে নিজ বাড়িতে। এরা কেউ নেই নিজ পল্টনের কাছে। প্রথম গোলার আওয়াজে যে সব অফিসার দুর্গাগুলের উত্তরে অফিসার কোয়ার্টারে



ব্রেস্ত কেল্লার নক্সা (১৯৪১)

১ — কেন্দ্রীয় দ্বীপ; ২ — দুর্গের উত্তরাঞ্চল; ৩ — পশ্চিম দ্বীপ; ৪ — দক্ষিণ দ্বীপ; ৫ — মাটির বাঁধ; ৬ — পূব গড়; ৭ — অফিসারদের কোয়ার্টার; ৮ — বৃত্তাকার ব্যারাক; ৯ — ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাক ভবন; ১০ — ক্লাব ভবন (প্রাক্তন গির্জা); ১১ — শ্বেত প্রাসাদ; ১২ — কেন্দ্রীয় দুর্গের ত্রিখিলান গেট; ১৩ — কেন্দ্রীয় দুর্গের তেরেস্পল্ গেট; ১৪ — কেন্দ্রীয় দুর্গের খোল্ম্ গেট; ১৫ — দুর্গের উত্তর (প্রধান) গেট; ১৬ — দুর্গের পূর্ব বা কোব্রিন গেট; ১৭ — দুর্গের উত্তর-পশ্চিম গেট; ১৮ — ৮৪ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাক; ১৯ — জুনের শেষ দিনে ফোমিন ও জুবাচিওভের সৈন্যদলের প্রতিরোধ ঘাঁটি; ২০ — সীমান্ত চৌকির ভবন।

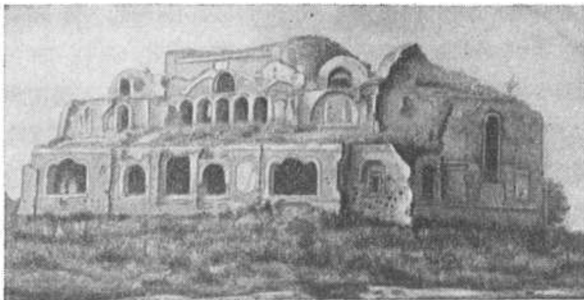
থাকত তারা 'কেন্দ্রীয় দ্বীপে' নিজ নিজ পল্টনের কাছে যাবার জন্য ছুটল। কিন্তু ঐ দ্বীপের সঙ্গে যুক্ত পুলটির উপর তখন অবিরাম চলেছে মেশিনগান। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে অন্তর্ঘাতকরা আগে থেকে মুখাভেৎস্ পেরিয়ে নদীর উপর ঝোপে লুকিয়ে ছিল। ওরা কেল্লার মাঝখানে যাবার রাস্তা আটকে রেখেছে মেশিনগান দিয়ে। সেদিন সকালে পুলের উপর বহু লোক মারা পড়ে, মাত্র কয়েক জন অফিসার কোনোক্রমে পুলগুলি পেরিয়ে নিজ নিজ দলের কাছে যেতে সক্ষম হয়। সহরে যারা ছিল তারা কেল্লার ফটকের কাছেও আসতে পারল না, কারণ জার্মানিদের চক্রাকার গোলাবর্ষণে কেল্লাটি ব্রেস্ত থেকে সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

শত্রু চটপট এই হঠাৎ আক্রমণের সুযোগ নিতে চাইল। বাঁ তীরের ঝোপঝাড় থেকে কামানগুলো গোলা দাগছে, সেই ফাঁকে '৪৫ নং পদাতিক ডিভিসনের' অগ্রবর্তী হামলাদারদের সাবমেশিনগানচালকরা রবারের নৌকো আর ভেলায় বুগ পেরিয়ে দুর্গের পশ্চিম আর দক্ষিণ দ্বীপগুলো আক্রমণ করল।

সীমান্ত চৌকি ও টহলদার সৈন্যের ক্ষুদ্র দল এই দ্বীপগুলিকে পাহারা দিচ্ছিল। যা সম্ভব সবই করল তারা। নদী তীরের ঝোপ আর নদী বরাবর মাটির প্রাচীরের উপর থেকে গোলাবারুদ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলি চালিয়ে গেল শত্রুর নৌকোর উপর। কয়েক দল সীমান্তরক্ষী পিলবক্সে, মাটির দেয়ালের নীচেকার খুপরিতে, ভেঙে-পড়া বাড়ির ভিতর তাক করে দাঁড়াল। সূচাগ্র ভূমিও তারা ছাড়বে না এই

তাদের প্রতিজ্ঞা। কিন্তু এই আক্রমণ ঠেকাবার মত খুব সামান্য লোকই তাদের আছে। শত্রুর গোলন্দাজ বাহিনী পাশবিক তেজে দুটি দ্বীপের উপর ক্রমাগত গোলা চালাতে লাগল, এই ভাবে পরিষ্কার হল পদাতিক বাহিনীর রাস্তা। ইতিমধ্যে নৌকোর পর নৌকো আর ভেলার পর ভেলা বুগ পেরুতে লাগল। সাবমেশিনগানচালকদের ঘন পঙ্‌ক্তি বাস্তবিকই দ্বীপদুটিকে ছেয়ে ফেলল, চৌকীর সামান্য সংখ্যক লোকদের সাবাড় বা ঘেরাও করে কেল্লার মাঝখানে দ্রুত এগিয়ে চলল।

দক্ষিণ দ্বীপে কোনো সোভিয়েত পল্টন ছিল না, ছিল শুধু রসদ আর বড় এক জেলা হাসপাতাল। হাসপাতালের কাছে থাকত পরিবারসহ হাসপাতাল কর্মীদের একাংশ। প্রথম আঘাতেই হাসপাতাল আর কর্মীদের বাড়িঘর বিধ্বস্ত হল, আগুন ধরে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে রোগীরা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে লাগল। ব্যাটালিয়ন কমিশার বোগাতেয়েভ হাসপাতালের ডেপুটি রাজনৈতিক প্রধান। বোমার টুকরোয় তার মাথায় আঘাত লাগলেও সে প্রতিরোধ গড়বার ব্যবস্থা করল, কিন্তু বলা বাহুল্য, শত্রুপক্ষের দুর্ধর্ষ পদাতিক বাহিনীর সামনে ডাক্তার, নার্স ও আর্দালীরা কিছুই করতে পারল না। এগিয়ে-আসা জার্মান সাব-মেশিনগানচালকদের সামনে তাদের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ পেল, স্বয়ং বোগাতেয়েভ নিহত হল। মাত্র কয়েকজন রোগী আর হাসপাতাল কর্মী খোল্‌ম্‌ গেটের পুল পেরিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যারাকে পৌঁছতে সমর্থ হল। বাকি সবাই আশ্রয় নিল



গ্যারিসন ক্লাবের (প্রাক্তন গির্জার) ধ্বংসাবশেষ

প্রাচীরের নীচে আর মাটির তলাকার কুঠরীতে। দ্বীপটিকে তচনচ করার সময় শত্রুপক্ষের সাবমেশিনগানচালকরা তাদের হত্যা বা বন্দী করল।

পশ্চিম দ্বীপে জার্মান পদাতিক বাহিনী সীমান্তরক্ষীর প্রতিরোধী দলের এক অংশকে ঘেরাও করল এবং এগিয়ে এল কেল্লার তেরেস্পল্ গেটের দিকে। সাবমেশিনগানচালকের বিরাট এক দল সঙ্গে সঙ্গে পুল পেরিয়ে ঢুকল ব্যারাক প্রাঙ্গণে।

কেন্দ্রীয় দ্বীপ ও তার চতুষ্পার্শ্বস্থ বাড়িঘরের মধ্যে প্রধান হল প্রাঙ্গণের মাঝখানে দাঁড়ান উঁচু সরু জানালাসহ বিরাট এক ভবন। এক সময় এটা ছিল গোঁড়া রুশদের ভজনালয়। পোলরা এটাকে বানায় ক্যাথলিক গির্জা। কেল্লায় সোভিয়েত সৈন্য আসার পর এটি পরিণত হয় সৈনিক ক্লাবে।

কেল্লা প্রাঙ্গণে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানিরা এই বাড়িটির সুবিধে বুঝতে পারে। তাছাড়া এটা খালি। প্রথম দিককার বিভ্রান্তির ফলে গ্যারিসনের কেউই এটাকে একটা শক্তিশালী আশ্রয়স্থল ভাবতে পারেনি। মুহূর্তের মধ্যে জার্মানিরা এটা দখল করে। সাবমেশিনগানচালকরা সঙ্গে একটা বার্তাপ্রেরক যন্ত্র নিয়ে আসে আর চারপাশে জানলায় তারা মেশিনগান বসায়।

সোভিয়েত রক্ষাব্যবস্থার একেবারে অন্তস্থলে আঘাত হানল এটা। কেন্দ্রীয় দ্বীপের মূল জায়গাটি এল শত্রুর দখলে। প্রতিরোধকারীদের পিছন দিকে প্রচণ্ড গুলি ছুড়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য ক্লাবের জানলাগুলি আদর্শ জায়গা।

সাফল্যের উৎসাহে শত্রু চেষ্টা করল এঁটে বসে তাদের অবস্থা আরও শক্তিশালী করতে। কেল্লার মাঝখানটা সম্পূর্ণ দখল করার জন্য সাবমেশিনগানচালকদের একটা দল এগুতে লাগল দ্বীপের পূব অংশের কিনার ধরে। রেডিও মারফৎ খবর পেয়ে জার্মানি গোলন্দাজ বাহিনী এই অঞ্চলে গোলা ছোড়া বন্ধ করল।

ক্লাবের উল্টোদিকে দ্বীপের পূর্বাঞ্চলে ছিল কংক্রিট আর লৌহদণ্ড দিয়ে তৈরী বেড়া ঘেরা একটি বাড়ি। এটা শ্বেত প্রাসাদ। ব্রেস্তের শান্তি চুক্তি এখানে একদিন সই হয়। ১৯৩৯ সালে এর অর্ধেকটা ধূলিসাৎ হয়েছিল।

প্রাসাদ প্রাচীরের দক্ষিণাংশ ব্যারাকের সমান্তরাল হওয়ায় একটি চওড়া রাস্তার সৃষ্টি হয়েছে। সাবমেশিনগানচালকরা দলবদ্ধভাবে এই রাস্তা ধরে এগিয়ে আসে, ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায়

পরস্পরকে হাঁক মেরে দু'পাশের জানলায় অবিরাম গুলি চালাতে থাকে।

তাদের গুলির কোন উত্তর আসে না। স্পষ্টতই কামান গোলা ও বিমান বোমার আক্রমণে বিধ্বস্ত ও অভিভূত সোভিয়েত গ্যারিসনের প্রতিরোধের আর কোন ক্ষমতা নেই, বিনা যুদ্ধেই দখল হবে কেল্লার কেন্দ্রস্থল। ধুলো ও ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দিয়ে জেগে-ওঠা দিনের আলোয় নজরে পড়ছে ব্যারাক বেষ্টনীর মধ্যেকার ফাঁক আর তীরের উপর লম্বা জল গম্বুজ। এখানে মুখাভেৎস্ দুটি ধারায় বিভক্ত।

এমন সময় একেবারে আকস্মিক ও স্তম্ভিত আক্রমণ এল শত্রুর উপর। ব্যারাকের ভিতরে একটা দীর্ঘস্থায়ী চাপা আওয়াজ শোনা গেল, প্রাঙ্গণে আসার দরজা সজোরে খুলে গেল হঠাৎ, প্রচণ্ড এক 'হুররা' ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একদল সোভিয়েত সৈন্য সঙ্গীন উঁচিয়ে এগিয়ে-আসা জার্মানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শত্রু হল বিধ্বস্ত। সঙ্গীনের আক্রমণ জার্মান দলকে ছুরির মত দু'ফাঁক করে দিল। সাব-মেশিনগানচালকদের যারা তখনও ব্যারাকের দরজা পর্যন্ত আসেনি আতঙ্কে ক্লাবঘর ও যে তেরেস্পল্ গেট দিয়ে তারা ভিতরে ঢুকেছিল সে দিকে ছুট মারল। দলের আর এক অর্ধেক সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীপের পূব দিকের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল দ্বীপের পূব ভূখণ্ডের দিকে, বিজয়োল্লাসে তাদের পিছু ধাওয়া করল সোভিয়েত সৈন্য। যে

মুহূর্তে কোনো জার্মান সাবমেশিনগানচালক মাটিতে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সোভিয়েত সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর অস্ত্র দখলের জন্য। কোনো সোভিয়েত সৈন্য পড়ে গেলে কোনো কমরেড তার রাইফেলটি নিয়ে শত্রুর উপর ক্ষমাহীন আক্রমণ চালাতে থাকে।

জার্মানদের মুখাভেৎসের তীরে ঠেলে নিয়ে গিয়ে দ্রুত সাবাড় করা হল। এদের কেউ কেউ সাঁতরে পার পাবার চেষ্টা করল কিন্তু তাদের উপর চলল সোভিয়েত হাল্কা মেশিনগান। ফ্যাশিস্টদের একটিকেও ওপারে পেঁছিতে হল না।

দুর্গ আক্রমণকারীদের উপর এই প্রথম পাল্টা আঘাত হানল ৮৪ নং পদাতিক রেজিমেণ্ট, এরা ছিল ব্যারাক বাড়ির দক্ষিণপূর্ব অংশে।

সেদিন রাতে কেল্লায় এই রেজিমেণ্টের একটি মাত্র পদাতিক ব্যাটালিয়ন আর হেডকোয়ার্টারের কয়েকটি পল্টন ছিল। অন্যান্য দুই ব্যাটালিয়নের সঙ্গে প্রায় সব অফিসাররাই গেছে শিবিরে কিংবা সহরে নিজ নিজ বাড়িতে রাত কাটাচ্ছে। মাত্র জন দু'তিন লেফ্‌টেনাণ্ট পল্টন-পরিচালক শুয়েছিল রেজিমেণ্টের হেডকোয়ার্টারের বাড়িতে। এ ছাড়া ওখানে ছিল আর একজন অফিসার। সে রেজিমেণ্ট কমিশার ইয়েফিম ফোমিন, তখনকার মত ঘুমচ্ছিল তার অফিসে।

আগের দিন সন্ধ্যায় তার আগেকার কর্মস্থল লাতভিয়া থেকে পরিবারকে ব্রেস্তে আনার জন্য ফোমিন কয়েকদিনের ছুটি পেয়েছিল। রাত প্রায় দশটায় সে গাড়ি করে যায় স্টেশনে,



রেজিমেন্ট কমিশার ইয়েফিম ফোমিন

কিন্তু টিকেট না পাওয়ায় ফিরে আসে কেল্লায় পরের দিন যাত্রা করবে বলে। রেজিমেণ্টের কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারী মাতেভোসিয়ানের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত সে কথাবার্তা বলে। ওরা ঘুমতে না ঘুমতেই কেল্লার উপর শত্রুর গোলা আর বোমাবর্ষণ সুরু হয়। ব্যারাকের এই অংশের জানালাগুলি সীমান্ত বরাবর মুখাভেৎসের দিকে। কয়েকটি গোলা এসে পড়ল ঘরের মাঝখানে, সুরু হল আগুন আর ধ্বংস। কয়েকটি জায়গায় সারি করে দাঁড়ান রাইফেলগুলো চূর্ণ হল বা চাপা পড়ল, সেইজন্য অনেক সৈন্যই নিরস্ত্র। ফোমিনের অফিসে পড়ল একটা আগুন গোলা। ঝাঁঝাল ধোঁয়ায় দম আটকে ফোমিন কোনরকমে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সে সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদলের ভার নিল। কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারী তার সহকারী। প্রাথমিক বিভ্রান্তি কাটাতে, লোকদের সশস্ত্র করতে এবং কুঠরীর ভেতর অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গায় ওদের জড় করতে কিছুটা সময় লাগল। সেখানে

ফোমিন একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেয়, তাদের দেশাত্মবোধক কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে প্রাণপণ সাহসের সঙ্গে লড়াইয়ের আহ্বান জানায়। এরপর ফোমিনের আদেশমত মাতেভোসিয়ানের নেতৃত্বে তার লোকেরা প্রথম সঙ্গীন আক্রমণ চালায়। এর ফলে দ্বীপের পূর্ব ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্ন শত্রু সাবমেশিনগানচালকরা নিশ্চিহ্ন হয়।



রেজিমেণ্টের সহকারী রাজনৈতিক সংগঠক সাম্‌ভেল মাতেভোসিয়ান, ১৯৪১

ইতিমধ্যে জার্মান সৈন্যদলের যে অবশিষ্টাংশ তেরেস্পল্ গেটের দিকে পালিয়ে যায় তারা দেখতে পেল তাদের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়া অসম্ভব। ফেরার পথ বন্ধ।

তেরেস্পল্ গেটের কাছে যে বাড়িগুলি তাতে ছিল ১৭ নং সৈন্যদলের তৃতীয় কম্যাণ্ডাণ্টের অফিস এবং সীমান্তরক্ষীদের নবম চৌকি। এই বাড়িগুলির পিছনে, কেল্লার মধ্যিখানের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে একটা লম্বা দোতলা বাড়ি। এতে থাকে ৩৩৩ নং পদাতিক রেজিমেণ্ট। অন্যান্য ইউনিটের মত সেদিন রাত্রে

লড়াই সুরু হবার আগে এই রেজিমেণ্টের অধীনে ছিল সামান্য কয়েকটি সৈন্যদল। তা ছাড়া এর মধ্যে ছিল নন-কমিশণ্ড অফিসার ইস্কুলের ছাত্র ও একটি ব্যান্ডবাদক দল।

প্রথম বোমার আঘাতেই কম্যান্ডাণ্টের অফিস ও সীমান্তরক্ষীদের চৌকি ধ্বংস হল। বহু সীমান্তরক্ষী, অফিসারদের স্ত্রীপুত্র ধ্বংসের নীচে চাপা পড়ল। ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাক বিধ্বস্ত হবার পর প্রচন্ড গোলাবর্ষণের হাত থেকে বাঁচার জন্য আধা পোষাক-পরা সৈনিকরা ছুটল ভূগর্ভস্থ কুঠরীতে। অন্যান্য জায়গার মত এখানেও সেই প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা। তেরেস্পল্ গেট দিয়ে প্রাঙ্গণে যে জার্মান সৈন্যরা ঢুকেছিল তারা কোন বাধাই পেল না।

কিন্তু যেখানে কমিশার ফোমিনের সঙ্গীন আক্রমণে জার্মান সৈন্য ছত্রভঙ্গ সেই দ্বীপের পূর্ব ভূখন্ডে যখন শত্রু এগুবার চেষ্টা করে এবং যে সময়ে ক্লাবটিকে সাবমেশিনগানচালকরা দখল করে সে সময় তেরেস্পল্ গেটের অবস্থাও পাল্টে গেছে।

সীমান্তরক্ষীরা প্রাথমিক বিশৃঙ্খলা তাড়াতাড়ি সামলে উঠে চৌকির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তাদের কম্যান্ডার লেঃ আন্দ্রেই কিজেভাতভের নেতৃত্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। লেঃ আলেক্সান্দ্র সানিন এবং সিনিয়র লেঃ পতাপভ যায় ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাকের সেলারে তাদের সৈন্যদলের ভার নেবার জন্য। যে সব মহিলা ও শিশু, যথাসময়ে তাদের নিরাপদে রাখা হল দুর্গভবনের গভীর সেলারে। রাইফেলধারী ও মেশিনগানচালকদের জানলায় দাঁড় করান হল। সঙ্গীন আক্রমণে

ছিন্নভিন্ন এবং ৮৪ নং রেজিমেণ্টের সৈনিকদের ধাওয়া করা জার্মান দলের অবশিষ্ট সৈন্যরা যখন তেরেস্পল্ গেটে হটে আসে তাদের উপর সরাসরি গ্দলি চালায় কিজেভাতভ, পতাপভ ও সানিনের লোকেরা। জার্মানদের যারা রক্ষা পেল তারা আশ্রয় নিল ক্লাবে, কারণ যে পথ দিয়ে তারা আধঘণ্টা আগে কেল্লা প্রাঙ্গণে ঢুকেছিল সেটা তখন বন্ধ।



নবম সীমান্ত চৌকির অধ্যক্ষ লেফ্টেনাণ্ট আন্দ্রেই কিজেভাতভ

একটা অদ্ভুত অবস্থার উদ্ভব হল। সাবমেশিনগানচালকরা কেল্লার মধ্যিখানে ঢুকে এর আসল ঘাঁটি ক্লাবঘরটিকে দখল করে। এরই জানলা দিয়ে মেশিনগান চালিয়ে তারা সোভিয়েত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করতে পারত। কিন্তু সেই সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পেল তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং ঘেরা পড়েছে। একমাত্র রেডিও ছাড়া সেনাপতিদের সঙ্গে ওদের যোগাযোগের আর কোন উপায় নেই। কিন্তু তখনও তাদের বিশ্বাস সত্বর তারা ম্দক্তি পাবে কারণ আরও বেশী তীব্রতার

সঙ্গে কেল্লার উপর আক্রমণ চলেছে এবং অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় শত্রু সৈন্য হামলায় যোগ দিচ্ছে।

পূর্ব ও পশ্চিম থেকে এগিয়ে শত্রুর পদাতিক বাহিনী চটপট কেল্লার চারপাশ ঘিরে ফেলল। কামানের গোলা চলেছে সমানে আর সেই সঙ্গে 'জাঙকার্স' বোমারু বিমান অসংখ্য অগ্নিকান্ডের ফলে ওঠা ঘন ধোঁয়ার মধ্যে কেল্লার উপর চক্কর দিচ্ছে। জার্মান সাবমেশিনগানচালকরা শুধু পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বীপে এবং দুর্গের কেন্দ্রস্থলেই ঢোকেনি, তারা বাঁধ পেরিয়ে দুর্গের উত্তরাঞ্চলেও ঢুকেছে। কেল্লার প্রায় অর্ধেকটাই শত্রু কবলিত। মনে হল আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লড়াইয়ের ফলাফল অবধারিত যাবে শত্রুর অনুকূলে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় দ্বীপে যা ঘটেছে কেল্লার অন্যান্য অংশেও ঘটল তাই। প্রথম দিককার বিস্ময় ও বিহ্বলতা কাটিয়ে সোভিয়েত সৈন্য দৃঢ় ও প্রচন্ডভাবে রুখে দাঁড়াল। শত্রুর গোলাবর্ষণে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও দুর্গের সব অঞ্চলে ঐ একই প্রতিরোধ। রমণী, শিশু ও আহতদের নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে সৈন্যেরা অস্ত্র তুলে নিল। জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে কোনো একজন সৈন্য চালনার ভার নিয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলল। যেখানে অফিসার নেই সেখানে সার্জেণ্ট বা সৈন্যদেরই একজন নেতৃত্ব করল। রাইফেল ও মেশিনগানের নির্ভুল টিপে প্রচুর হামলাদার মারা পড়তে লাগল। স্নাইপাররা জার্মান অফিসারদের সাবাড় করল আর সংকট মুহূর্তে সোভিয়েত পদাতিকদের সঙ্গীন আক্রমণ শত্রুকে

অবধারিত হঠাতে লাগল। এতে শত্রুর হতাহতের সংখ্যা দাঁড়াল প্রচণ্ড।

শত্রুর হানাদারি সৈন্যদের ক্লাবঘরে কেন্দ্রীয় দুর্গে ঢুকে আটক-পড়া সাবমেশিনগানচালকদের উদ্ধার করার সব চেষ্টা হল ব্যর্থ। তেরেস্পল্ গেটে বুগের পুলের উপর চলল রাইফেল আর মেশিনগানের গুলি। সীমান্তরক্ষী ও ৩৩৩ নং রেজিমেন্টের লোকেরা কাউকে এগুতে দিল না। দক্ষিণ দ্বীপে হাসপাতাল দখল করার পর মুখাভেৎসের উপর দিয়ে খোল্‌ম্ গেট পর্যন্ত যে পুল তাই ধরে জার্মানিরা কেন্দ্রীয় কেল্লার প্রাঙ্গণে ঢুকবার চেষ্টা করল। কিন্তু পুলের ঠিক উল্টোদিকে বৃত্তাকার ব্যারাকের মধ্যে ৮৪ নং রেজিমেন্টের ঘাঁটি। কমিশার ফোমিন দক্ষিণ দ্বীপ থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা আগে থেকেই আঁচ করে হাসপাতালের দিকের জানলায় নিজের লোক মোতায়েন করেছিল। আক্রমণের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই রাইফেল ও মেশিনগানের গুলি পুলের উপর থেকে সাবমেশিনগান-চালকদের বাস্তবিকই লোপাট করতে লাগল। সমস্ত দিন বার বার চেষ্টা এবং পুল মৃতদেহে ভরে যাওয়া সত্ত্বেও শত্রু গেটে পৌঁছতে পারল না। জার্মানিরা রবারের নৌকায় মুখাভেৎস্ পার হতেও পারল না। সোভিয়েত পদাতিকদের গুলি খেয়ে সাবমেশিনগানচালক সৈন্য বোঝাই বহু নৌকা তলিয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে জার্মান নেতারা লক্ষ্য করল দুর্গ গ্যারিসনের প্রতিরোধ শক্তি না কমে, আসলে তা আরও বেশী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে উঠছে, দুর্গ অঞ্চলে গড়ে উঠছে একটার পর

একটা প্রতিরোধ কেন্দ্র। শত্রু কবলিত পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বীপে সোভিয়েত সীমান্তরক্ষীদের নানা দল প্রচণ্ড লড়াই চালাল যদিও তারা ঘেরাও আর বিচ্ছিন্ন হয়েছে সাবমেশিনগান-চালকদের আক্রমণে। সবুজ শীর্ষ টুপি মাথায় এই লোকগুলি এমন মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করল এবং শত্রুর এমন প্রচণ্ড ক্ষতি করল যে ক্রুদ্ধ নাজি অফিসাররা এমনকি আহত সীমান্তরক্ষীদের বন্দী হিসেবে না নিয়ে সেখানেই গুলি করে মারবার হুকুম দিল।

কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই সীমান্তরক্ষীরা বন্দী হিসেবে ধরা দিল না। হয় তারা লড়াই করে মরবে বা আত্মহত্যা করবে তবু শত্রুর হাতে জীবন্ত ধরা দেবে না। এই ভাবে পশ্চিম দ্বীপে মৃত্যু বরণ করে তরুণ বেলোরুশীয় সার্জেণ্ট পেত্রিন্‌চিক। আহত এবং সাবমেশিনগানচালকদের দ্বারা ঘেরাও হয়েও বহুক্ষণ সে লড়াই চালায় একটা বিধ্বস্ত বাড়িতে পড়ে থেকে। তার প্রতিটি গুলি নির্ভুলভাবে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছয়, কেবল শেষটি ছাড়া। সেটি ও রাখে নিজের জন্য।

এই ভাবে মৃত্যু বরণ করে আর এক অজ্ঞাত সীমান্তরক্ষী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার রাতে একটা সেলের বাইরে সে পাহারা দিচ্ছিল। আগের দিন ধরা-পড়া দুজন জার্মান গুপ্তচর ছিল এই সেলে। তার চারপাশে জার্মানদের গোলা পড়া সত্ত্বেও সে তার পাহারার জায়গা ছাড়েনি। সাবমেশিনগানচালকরা দেখা দিলে তাদের রুখতে লাগল গুলি ছুড়ে। গুপ্তচরদুটো পাগলের মত সেলের দরজার উপর ধাক্কা দিতে লাগল,



ব্রেস্ত দুর্গের এক দল সীমান্তরক্ষী

সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল জোরে। হামলাদাররা ওদের ডাক শুনে আরও বেশী চেষ্টা করতে লাগল ওদের কাছে এগুবার। পাহারাদারের কাছে তখন মাত্র এক ঝাঁক গুলি। শত্রুকে আর রুখতে পারবে না বুঝতে পেরে সে মনস্থির করল। জার্মান সাবমেশিনগানচালকরা যখন সেলে ঢুকল দেখল তিনটে মৃতদেহ। তরুণ সান্ত্রীটি দুজন গুপ্তচরকে হত্যা করে নিজের বুকে গুলি চালিয়েছে।

কেল্লার উত্তরাঞ্চলে একটা পাকা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠল। এখানে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন দলকে জড় করা হয় এবং এর

নেতৃত্ব করে ৪৪ নং পদাতিক রেজিমেণ্টের পরিচালক মেজর গাভ্রিলভ। জার্মানদের গোলাবর্ষণ সুরু হতেই অসুস্থ স্ত্রী ও ছোট ছেলেকে ঘরে রেখে সে হেডকোয়ার্টারে ছুটে আসে, ইচ্ছে রেজিমেণ্টের পতাকা ও গুপ্ত কাগজপত্র রক্ষা করা। রেজিমেণ্টের হেডকোয়ার্টার কেন্দ্রীয় দ্বীপে বৃত্তাকার ব্যারাকের একেবারে পশ্চিমাঞ্চলে। এখানে শত্রুর গুলি চলছিল বিশেষ প্রচণ্ড। গাভ্রিলভ ওখানে পৌঁছবার আগেই বাড়িতে আগুন ধরে গেছে। ভিতরে ঢোকা অসম্ভব কারণ জ্বলন্ত বাড়িটিতে তখনও গোলা পড়ছে। স্পষ্টই বোঝা গেল আগুনের শিখায় পতাকা ও কাগজপত্র আগেই পুড়ে গেছে। আধা অন্ধকারে, বিস্ফোরণের ফলে ফুলে-ওঠা ধোঁয়া ও ধুলোর মাঝখানে প্রাঙ্গণের মধ্যে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করা সৈন্যদের দেখতে পাওয়া গেল। কোনো রকমে নিজের দলের দুয়েক ডজন লোক জোগাড় করে গাভ্রিলভ তাদের নিয়ে গেল পুল পার করে ব্রেস্তের উত্তর সীমান্তে। বিপদের সঙ্কেতে এখানে সমস্ত রেজিমেণ্টের জড় হওয়ার কথা।

দেখা গেল জার্মানিরা সহরের রাস্তা ইতিমধ্যেই আটকে দিয়েছে। সোভিয়েত পদাতিকরা উত্তর গেটের কাছে মাটির বাঁধ ও দুর্গ পরিখার তীরে শুয়ে গুলি চালাতে লাগল। ওপারে নজরে পড়ছে ঝোপের ভিতরে সতর্কভাবে জার্মান সাবমেশিনগানচালকদের ঘোরাফেরা।

উত্তর গেটে জড় হল কয়েক শত সোভিয়েত সৈন্য। এদের ভিতর ছিল দু'তিনজন লেফ্‌টেনাণ্ট ও কয়েকজন রাজনৈতিক

সংগঠক। কোনো উচ্চপদস্থ অফিসার না থাকায় গাভ্রিলভ নানা রেজিমেণ্টের এই বিচ্ছিন্ন দলগুলির ভার নিল এবং এদের নিয়ে তিনটি কোম্পানি গড়ে তুলল। তার নির্দেশ মত পদাতিকরা উত্তর ও উত্তরপূর্ব বাঁধের ভার নিল। একটি দল প্রস্তুত হল পশ্চিম থেকে আক্রমণ রুখবার জন্য। ১২৮ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাক যেখানে অবস্থিত সেখান থেকে প্রচণ্ড লড়াইয়ের আওয়াজ ও আক্রমণ চালিয়ে-যাওয়া সাবমেশিনগান-চালকদের চিৎকার শোনা গেল।

এই প্রতিরোধ অঞ্চলের কেন্দ্রে গেটের দিক্‌কার রাস্তার পূব ও পশ্চিমে ছিল দুটি ছোট গড়। প্রত্যেকটির দুটি করে ঘোড়ার নালাকৃতি বাইরের প্রাচীর, তাদের মাঝখানে অপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে গড়ের বিরাট নিরাপদ অংশ, গড়ের মাঝখানে পুরু দেওয়ালওলা বাড়ি এবং প্রাচীরের মধ্যে নিরাপদ ঘরগুলিকে শক্ত ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা চলে। গাভ্রিলভ একটি কোম্পানিকে হুকুম দিল পশ্চিম গড়ে ঘাঁটি গাড়তে এবং কাছাকাছি সম্প্রতি তৈরী পিলবক্সে একটা ভারি মেশিনগান বসাতে।

পূব গড়টিই কিন্তু গাভ্রিলভ দলের প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রধান ঘাঁটি হল। দেখা গেল সিনিয়র লেঃ শ্রাম্‌কো, লেঃ দামিয়েঙ্কো এবং ১২৫ নং পদাতিক রেজিমেণ্টের লেঃ ইয়াকভ কলোমিয়েৎসের পরিচালনায় ৩৯৩ নং স্বাধীন বিমান-ধ্বংসী কামানচালক দলের লোক দিয়ে তৈরী ক্ষুদ্র গ্যারিসন এই গড়ে মোতায়েন ছিল। গোলন্দাজ দল গড়ের মাঝখানে বাড়িতে

ঘাঁটি গেড়ে ইতিমধ্যেই লড়াইয়ের জন্য তৈরী। বাড়ির দোতলার জানলায় একটা বিমান-ধ্বংসী ভারি মেশিনগান বসান হল, দুজন লোক দ্রুতগতি স্পেয়ার বেল্টে গুলি ভরছে, বাকি জানলাগুলিতে লোক মোতায়েন করা হল হাল্কা মেশিনগান ও রাইফেলসহ। বিমান-ধ্বংসী কামানচালক দলের একটি চালু বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র, টেলিফোন ও বাড়তি তার ছিল। ভাঁড়ার ঘরে ছিল রসদ ও গোলাবারুদ। গড়ের কাছে পরিখায় ছিল দুটো বিমান-ধ্বংসী কামান। একজন লেফ্টেনান্টের অধীনে চটপট এ দুটোর কাছেও মোতায়েন করা হল কয়েকজন লোক।

গাভ্রিলভ বিমান-ধ্বংসী কামানচালক দলের ভার নিল। ক্যাপ্টেন কন্স্তানতিন কাসাত্কিন ছিল স্বাধীন যোগাযোগ ব্যাটালিয়নের প্রাক্তন পরিচালক। গাভ্রিলভ পূব গড়ে হেডকোয়ার্টার গড়ে তুলল এবং তার পরিচালনার ভার কাসাত্কিনের ওপর চাপাল। কাসাত্কিনের ব্যাটালিয়ন তখন ব্রেস্তের বাইরে শিবিরে। সেদিন রাতে ও দুর্গে এসেছিল পরিবারের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে, আর এখানেই লড়াইয়ে আটকা পড়ল। দুর্গ থেকে বেরিয়ে নিজের ব্যাটালিয়নের সঙ্গে মিলতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু জার্মানরা সহরের রাস্তাটি দখল করে বসেছে। ফলে মেজর গাভ্রিলভের দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর রইল না। হেডকোয়ার্টারের প্রধান নিযুক্ত হতেই সে সঙ্গে সঙ্গে গড়ের কেন্দ্রস্থলে একটি ঘরে সৈন্য পরিচালনার ঘাঁটি বানাল এবং বিমান-ধ্বংসী কামানচালক দলের যোগাযোগ-



ক্যাপ্টেন কন্‌স্তান্তিন কাসাত্‌কিন, ১৯৪১

কারীদের সাহায্য নিয়ে তিনটি কোম্পানির সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের ব্যবস্থা করল। ইতিমধ্যে গাভ্রিলভ কর্তৃক নিযুক্ত তার প্রথম সহকারী রাজনৈতিক সংগঠক স্ক্রিপ্‌নিক অফিসারদের কোয়ার্টার থেকে নারী ও শিশুদের সরিয়ে নিয়ে গেল গড়ের এক আশ্রয়-স্থলে। সেখানে ও একটি হাসপাতাল বানাল। এর ভার দিল সহকারী সার্জন রাইসা আবাকুমভাকে।

মেজর গাভ্রিলভের ক্ষুদ্র দলটি শত্রুকে রুখবার জন্য তৈরী হল। ঘণ্টাখানেক বাদে শত্রু যখন বাইরের দেয়াল এবং পশ্চিম গড়ে হামলা করল তাদের উপর দুর্দান্তভাবে গোলাগুলি চলল, এই অঞ্চলে তাদের সমস্ত আক্রমণ হল ব্যর্থ।

পূবে কোব্রিন্‌স্কি গেটের কাছেও সুরু হল প্রচণ্ড লড়াই। এখানে মেজর নিকিতিনের অধীনে মোতায়েন ছিল ৯৮ নং ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী গোলন্দাজ ব্যাটালিয়ন। গোড়া থেকেই শত্রু এই দিকটায় বিশেষ করে প্রচণ্ড গোলা চালাতে থাকে। বেশীর

ভাগ কামান আর ট্র্যাক্টর ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার উপর কম্যাণ্ডার প্রাণ হারায়। দলটির ভার নিল নিকিতিনের সহকারী সিনিয়র রাজনৈতিক সংগঠক নিকলাই নেস্তের্‌চুক এবং ব্যাটালিয়নের হেডকোয়ার্টারের কর্তা লেঃ ইভান আকিমচ্‌কিন।

রমণী ও শিশুদের বাঁধের ভিতর আশ্রয় দেবার আদেশ দিয়ে নেস্তের্‌চুক ও আকিমচ্‌কিন লোকদের বলে বাকি কামানগুলোকে বাঁধের উপর বসাতে। তারা গোলাবারুদ সরবরাহের ব্যবস্থা করে এবং মেশিনগানচালক ও রাইফেলধারীদের প্রতিরোধের কাজে মোতায়েন করে। যখন জার্মানরা দুর্গের দক্ষিণ-পূব পাশে ঘুরে এসে দেখা দেয় কোব্রিন্‌স্কি গেটের কাছে তখন সোভিয়েত গোলন্দাজ ও মেশিনগানচালকরা কাছ থেকে শত্রুর উপর গুলি চালায়। শত্রু বাধা পেল। সোভিয়েত কামানের হন্তারক গোলাবর্ষণে ওদের একটার পর একটা আক্রমণ বরবাদ হয়ে যায়।

২২শে জুনের প্রথমার্ধ কেটে গেল ক্রমবর্ধমান দুর্ধর্ষ লড়াইয়ে। জার্মানরা কেল্লার উপর সমানে গোলা চালাতে লাগল। প্রধান প্রধান সোভিয়েত প্রতিরোধ কেন্দ্রের উপর 'জাঙ্কার্সগুলো' ছোঁ মেরে বোমা ফেলতে লাগল, পদাতিক বাহিনী আক্রমণ চালাল সবদিকে। কিন্তু অচিরেই হামলাদারদের মৃত্যুর সংখ্যা এমন আতঙ্কজনকভাবে বেড়ে গেল যে জার্মান সমর নেতারা বাধ্য হল সেদিকে ভালো করে নজর দিতে।

বহু মাস বাদে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রন্টের এক অঞ্চলে ৪৫ নং পদাতিক ডিভিসনের দলিল ধরা পড়ে। তার ভিতর

ছিল 'ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক দখলের সংগ্রাম বিবরণী'। ব্রেস্ত কেল্লার লড়াই সম্পর্কে কিছুটা বিশদ তথ্যসহ এ এক অদ্ভুত দলিল। শত্রুদলের অফিসারদের দেখা বিবরণ মতে লড়াইয়ের প্রথম দিনে কেল্লায় যা ঘটেছিল তা এই।

বিবরণীতে লেখা: 'খুব শীঘ্রই (৫.৩০ থেকে ৭.৩০এর মধ্যে) এটা স্পষ্ট হল, যে আমাদের এগিয়ে-যাওয়া পদাতিক বাহিনীর পিছনে দৃঢ় ও অক্লান্তভাবে রুশিরা প্রতিরোধ চালাতে শুরু করেছে পদাতিক বাহিনীর লড়াইয়ে। দুর্গের ৩৫ থেকে ৪০টি পর্যন্ত ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ীকে তারা কাজে লাগিয়েছে। চিলেঘর ও দুর্গের ভূগর্ভ থেকে দ্রুত গুলি চালিয়ে তারা আমাদের অনেক অফিসার ও নন-কমিশণ্ড অফিসারকে সাবাড় করেছে।

'লাঞ্চের আগেই এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে দুর্গের কাছাকাছি লড়াইয়ের সময় গোলন্দাজ বাহিনীর পক্ষে কোন সাহায্য করাই সম্ভব নয়, কারণ আমাদের পদাতিক দল রুশিদের খুব কাছে এগিয়ে এসেছে; দালান, ঝোপঝাড় ও ধ্বংসাবশেষের গোলক ধাঁধায় আমাদের সৈন্যরা কোথায় আছে বোঝা অসম্ভব। জায়গায় জায়গায় রুশি প্রতিরোধ হয় আমাদের সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন করেছে, অথবা তাদের আটকে দিয়েছে। খোলা জায়গায় পৃথক ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী গোলন্দাজ বা হাল্কা গোলন্দাজ দলের চেষ্টাও বেশীর ভাগই ব্যর্থ হল, এর প্রধান কারণ ভাল করে দেখার সুযোগ যেমন যথেষ্ট নেই তেমনি আমাদের সৈন্যদের বিপদের সম্ভাবনা; দ্বিতীয়ত দুর্গের বাড়ি আর দেয়াল পুরু।

'এই একই কারণে ১৩৫ নং পদাতিক রেজিমেণ্টের কম্যান্ডার নিজ থেকে লাঞ্চের পরে যে হামলাদার গোলন্দাজ দলকে পরিচালনা করেন তাতেও কোন ফল হয় না।

'১৩৩ নং পদাতিক রেজিমেণ্টের নূতন সৈন্যদলকে (আগেকার সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনী) দুপুর ১.১৫ মিনিটের পর দুর্গের দক্ষিণ ও পশ্চিম দ্বীপে লাগিয়েও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটান গেল না। যেখানেই রুশিরা বিতাড়িত বা গুলিতে আটকে পড়ল সেখানেই দুর্গ তলের কুঠরী, বড় পাইপ বা অন্যান্য গুপ্ত স্থান থেকে নূতন সৈন্যদল সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতে লাগল। তাদের হাতের টিপ চমৎকার, ফলে আমাদের সৈন্যদের মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে গেল অত্যধিক।

'দুপুর ১.১৫ মিনিটে ডিভিসনের কম্যান্ডার ব্যক্তিগতভাবে ১৩৫ নং পদাতিক রেজিমেণ্ট (উত্তর দ্বীপ) পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে হানা দিয়ে কেল্লা ফতে করা যাবে না। দুপুর আড়াইটে নাগাদ দুর্গটিকে সর্বদিক থেকে ঘিরে ফেলবার জন্য তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নেওয়া সাব্যস্ত করেন এবং স্থির করেন ২৩শে তারিখের ভোর থেকে (রাত্রিতে সৈন্য সরিয়ে ফেলে) সতর্ক পর্যবেক্ষণসহ কেল্লার উপর গোলাবর্ষণ করবেন, উদ্দেশ্য রুশিদের পরিশ্রান্ত করে সাবাড় করা। বিকেল ৬.৩০ মিনিটে ৪র্থ সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মেনে নেন...'

এই বিবরণীতে কেল্লার জন্য প্রথম দিনকার লড়াইয়ের মোটামুটি সঠিক চিত্র পাওয়া যায়। সত্যি কথা এই যে জার্মানি

অফিসাররা যে সংখ্যা বলে প্রতিরোধকারীদের কাছে সেই প'য়ত্রিশ বা চল্লিশটি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী ছিল না, ছিল কয়েকটি ট্যাঙ্ক আর গাড়ী এবং হামলাদারদের প্রধান প্রতিবন্ধ দুর্গ প্রাচীরের ঘনত্ব নিশ্চয়ই নয়। আসলে তা হল এই ক্ষুদ্র গ্যারিসনের বীরত্বপূর্ণ একরোখা প্রতিরোধ। তাদের দৃঢ়পণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় প্রথম দিনের লড়াইয়ে জার্মান সৈন্যরা দুর্গে এসে থমকে যেতে বাধ্য হয়। আর যে শুধু বাধাই পায় তাই নয়। ২২শে জুন সন্ধ্যায় হামলাদাররা যে আদেশ পায় আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান সৈন্যদের প্রতি সেই প্রথম পশ্চাদপসরণের আদেশ। জার্মান সৈন্য আগে কখনো ইউরোপের পশ্চিম উত্তর বা দক্ষিণে পিছু হটেনি, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের যুদ্ধে ব্রেস্ত দুর্গ এলাকায় প্রথম দিনেই তারা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

বিবরণীতে আরও বলা হয়: 'যে সৈন্যদল কেল্লায় অনুপ্রবেশ করেছিল, নির্দেশ মত তারা রাতের মধ্যেই অবরোধের জায়গাটিতে ফিরে যায়। যে সব জায়গা পরিত্যক্ত হয় রুশিরা সঙ্গে সঙ্গে সেই অঞ্চলে আক্রমণ চালাবার ফলে অবস্থা আরও ঘোরাল হয়ে ওঠে। ওদিকে একদল জার্মান সৈন্য (পদাতিক ও স্যাপার — এদের সংখ্যা কখনো নির্ধারিত হয়নি) আটকা পড়ে দুর্গের গির্জায় (কেন্দ্রীয় দ্বীপে)। আটক-পড়া লোকগুলোর সঙ্গে থেকে থেকে রেডিও যোগাযোগ চলতে থাকে।'

এ কথা বলা দরকার যে এই বেতার যোগ বিচ্ছিন্ন হতে দেরী হয়নি। জার্মানরা যেখান থেকে সরে যায় দুর্গ গ্যারিসন

যে কেবল সে অঞ্চলে আক্রমণ চালায় এবং ঘাঁটি গাড়ে তাই নয়, তারা ঘেরাও করা বহু শত্রুদলকে নিশ্চিহ্ন করে। কেন্দ্রীয় দ্বীপে ফোমিনের লোকেরা এবং পতাপভ ও কিজেভাতভের পদাতিকরা ক্লাবের উপর জোড়া আক্রমণ চালায়। এখানে সাবমেশিনগানচালকরা বেতার বার্তা প্রেরক যন্ত্র বসিয়েছিল। শত্রুর প্রতিরোধ শেষ হয়, ক্লাব ঘরের ফ্যাশিস্ট দলকে সাবাড় করা হয়।

প্রথম দিনে ছকমত শত্রু যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেল্লা ফতে করতে পারেনি তাই নয়, তার হামলাদাররা সংখ্যায় অর্ধেক হয়ে যায়। কোন কোন জায়গায় তারা একেবারেই সাবাড় হয় বা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কেবলমাত্র সেই দক্ষিণ ও পশ্চিম দ্বীপ থাকে জার্মানিদের হাতে যেখানে তখনও সোভিয়েত সীমান্ত-রক্ষীদল লড়াই চালাচ্ছিল। বাস্তবিকই ধূসর সবুজ ইউনিফর্ম পরা মৃতদেহ ভর্তি বাকি সমস্ত দুর্গ অঞ্চল ছিল তখনও শত্রুর হাতের বাইরে। এসব জায়গায় সোভিয়েত সৈন্য ও তাদের নেতারা সারা রাত জেগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ় করে, ভোরের বেলা নূতন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়।

যুদ্ধের সম্মুখভাগে

ব্রেস্ত কেল্লার রক্ষীদের মধ্যে, অফিসার থেকে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত প্রত্যেকের মনে লড়াইয়ের শুরু থেকে একটি

ধারণা কাজ করছিল। দুর্গরক্ষীদের এই স্থির ও গভীর বিশ্বাস ছিল, যে শত্রু এমন বিশ্বাসঘাতকভাবে ওদের দেশ আক্রমণ করেছে তাদের পরাস্ত ও রাষ্ট্র সীমান্তের ওপারে বিতাড়িত হতে দেরী নেই। যে কোন মুহূর্তে ব্রেস্ত অঞ্চলের সোভিয়েত সৈন্য অবরুদ্ধ কেল্লা উদ্ধারের জন্য হাজির হবে, পাকাপাকিভাবে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত হবে সীমান্ত অঞ্চল।



বেতারপ্রেরক বরিস মিখাইলভ্স্কি

সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকরা তাদের বিরাট দেশ ও সৈন্যবাহিনীর শক্তি সম্পর্কে সুপরিচিত। সোভিয়েত সৈন্য যুদ্ধ জয়ের ঐতিহ্য নিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। একবারের জন্যও তাদের মনে শত্রুর বিরাট শক্তি ও তার আকস্মিক আক্রমণের সাংঘাতিক ফলের কথা মনে হল না। তখন কি ভুলেও একথা কেউ মনে করতে পেরেছিল যে দীর্ঘ তিন বছরের আগে বিধ্বস্ত দুর্গ প্রাচীরের মধ্যে সোভিয়েত সৈন্য ঢুকতে পারবে না? লড়াইয়ের প্রথম দিনে দুর্গ রক্ষীদের মধ্যে কেউ যদি এ কথা বলত যে হিটলার জার্মানীর আক্রমণ সাবাড় করার জন্য

সোভিয়েত সৈন্যের সেখানে পেঁছিতে দু'চার বছর তো নয়, এমনকি কয়েক সপ্তাহ বা মাস লাগবে তাহলে তার সঙ্গীরা তাকে পাগল ভাবত বা ভীরু ও বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গুলি করে মারত। তারা আশা করছিল যে কোন মুহূর্তে সাহায্য এসে পৌঁছবে। নিজের লোকরা সত্বর এই অসম যুদ্ধে নূতন শক্তি জোগাবে এই চিন্তায় তাদের ইচ্ছা শক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয় আরও দানা বাঁধল।

আক্রমণের প্রথম কয়েক ঘণ্টায় কেল্লাটি বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, জার্মানি সৈন্য ঘেরাও করে একে। দুর্গ প্রাচীরের বাইরে কী ঘটছে, সহর ও আশেপাশের অঞ্চলেই বা কী চলেছে এই সোভিয়েত সৈন্যদল তা জানত না। ব্রেস্তে ওদের সৈন্যদলের হেডকোয়ার্টার, কিন্তু তখনো পর্যন্ত সহর থেকে কোন নির্দেশ এল না, সম্ভবত এই কারণে যে কোন বার্তাবাহক বা সংযোগবিধায়ক এসে পেঁছিতে পারল না। সামরিক অভিযানের আগেই জার্মানি অন্তর্ঘাতকরা হয় টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দিয়েছে, কিংবা গোলার আঘাতে তা নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমটায় কেন্দ্রীয় দ্বীপের প্রতিরোধীদের অফিসাররা রেডিওর সাহায্যে তাদের সেনাপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল, কিন্তু দলের বেশীর ভাগ বেতার যন্ত্রই গোলার আঘাতে সাবাড় বা খারাপ হয়ে গেছে। একমাত্র ৮৪ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাকে যোগাযোগ কোম্পানির কিছু যন্ত্রপাতি অক্ষত ছিল। এখানে দুপুর নাগাদ একটা বেতার যন্ত্র বসান সম্ভব হয়। রেজিমেণ্ট কমিশার ফোমিন সাংকেতিক পদ্ধতিতে

ডিভিসনের সেনাপতির জন্য বেতারবার্তা লিখে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে পাঠাতে আদেশ দেয়।

কিন্তু ডিভিসনের বা অন্য কোন বেতার কেন্দ্র থেকে উত্তর পাওয়া গেল না। সাংকেতিক পদ্ধতিতে বার্তা প্রেরণের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। মনে হল জার্মানরা যে শুধু কেল্লাটিকে ঘেরাও করেছে তাই নয়, ঈথারকেও যেন দখল করে আছে। সমস্ত ওয়েভ লেংথ'এ কর্কশ গলায় জার্মানদের হুকুম শোনা গেল, মাঝে মাঝে কোথাও ট্যাঙ্কের লড়াই বা আকাশে 'জাংকার্স' ও 'মেসার্‌শ্‌মিটের' সঙ্গে সংগ্রামরত আমাদের বৈমানিকদের তীব্র চিৎকারে তা কেটে যাচ্ছে।

ফোমিন তখন ঠিক করল সংকেত ছেড়ে সোজা কথা ব্যবহার করবে। পাছে তার খবর শত্রুরা শুনে ফেলে এ জন্য সে সোভিয়েত সৈন্যের সাফল্য অতিরঞ্জিত করে এক বেতারবার্তা লিখল। কমসমল সভ্য বার্তাপ্রেরক মিখাইলভ্‌স্কি আবার মাইক্রোফোনে বসল।

'কেল্লা থেকে বলছি, কেল্লা থেকে বলছি!' নূতন বার্তা ঈথারে শোনা গেল। 'লড়াই চালাচ্ছি আমরা। গোলাবারুদের অবস্থা ভাল। ক্ষতি সামান্য। নির্দেশের অপেক্ষা করছি। শেষ।'

বার বার মিখাইলভ্‌স্কি এই কথা কয়টি বলল, কিন্তু কোন উত্তর পেল না। কারেণ্ট সরবরাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বার্তাপ্রেরক যন্ত্র থেকে এই খবর ক্রমাগত যেতে লাগল। তার পর বীর কেল্লার কণ্ঠ গেল স্তব্ধ হয়ে।

গাভ্রিলভের নির্দেশ মত পূর্ব গড় থেকে যে বার্তাপ্রেরক ক্রমাগত বার্তা ঈথারে পাঠিয়েছে তার চেষ্টাও একইভাবে ব্যর্থ হল। কোন জবাব নেই। মেজর বুঝতে পারল বেতার যোগাযোগের সব চেষ্টাই ব্যর্থ, তাই ব্যাটারি বাঁচাবার জন্য সে বেতার যন্ত্র বন্ধ করার হুকুম দিল, উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সর্বশেষ সংবাদ বুলেটিন শোনা।

লড়াইয়ের প্রথম দিনটিতে কয়েকটি পল্টনের কাছে চালু সংবাদগ্রাহক যন্ত্র ছিল। ৯৮ নং ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ব্যাটালিয়নের ক্লাবে এমনি একটি যন্ত্র ছিল। ক্লাবটি ছিল মাটির তলায় কংক্রীট করা প্রকোষ্ঠে। আগে এটা ছিল ভাঁড়ার। বর্তমানে গোলন্দাজ দলের কম্যান্ডার নেস্তেরচুক এখানে অফিসারদের স্ত্রী ও ছেলেপুলেদের জায়গা দিয়েছে। এই অন্ধকার মাটির নীচের কুঠরীতে লাল ফৌজের সৈন্য সকলোভ ব্যাটালিয়নের পতাকা পাহারা দিচ্ছে। বেতার যন্ত্রের কাছে সে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। তার চারপাশে মেঝের উপর জড়াজড়ি করে আছে নারী ও শিশুরা। মাথার উপর ফেটে পড়া গোলার তীব্র আওয়াজের ভিতর দিয়ে মস্কো থেকে এক দূরবর্তী স্বর ভেসে আসছে। তাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর হিটলারের হামলার খবর।

পূর্ব গড় এবং কেন্দ্রীয় দ্বীপে ৩৩৩ নং পদাতিক রেজিমেণ্টের যোগাযোগকারীরাও মস্কোর এই বেতারবার্তা শুনতে পায়। সেই ছোটো সেলারে মস্কো বেতার ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যায় খুবই মৃদু কারণ ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে। তা

সত্ত্বেও সৈন্যরা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বেতারগ্রাহক যন্ত্রের চারপাশে ভীড় করে রইল।

ইতিমধ্যে হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা চলতে লাগল। দিনভর বিভিন্ন সময়ে দুর্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহরে পেঁছবার হুকুম দিয়ে টহলদার সৈন্যদল পাঠান হল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জার্মান পদাতিক বাহিনীর কঠোর বেষ্টনী ভাঙতে পারল না এরা, ফিরে এল হীনবল হয়ে। অন্যরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ব্যক্তিগতভাবে দু'এক জন সহরে পেঁছে থাকলেও ফিরে এসে খোঁজ খবর দিতে পারল না।

দুপুরে কমিশার ফোমিন স্থির করল সাঁজোয়া গাড়ীতে সহরে লোক পাঠাবে।

শ্বেত প্রাসাদের বেষ্টনীর মধ্যে একটি বাড়িতে ছিল বিশেষ গুপ্তচর দল। লড়াই সুরু হওয়ার রাতটিতে তারা ব্যাটালিয়নের ব্যারাকে ঘুমচ্ছিল। বাইরের গ্যারেজে ছিল সাতটি সাঁজোয়া গাড়ী। এগুলোকে মেরামতের জন্য আনা হয়েছিল। গোলাগুলির মধ্যেই ব্যাটালিয়নের কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারীর পরিচালনায় এরা কয়েক ঘণ্টায় পাঁচটি গাড়ীকে চালু করে ফেলে। একটা জ্বলন্ত অস্ত্রাগার থেকে কিছু গোলা আর কার্তুজ বার করে ভর্তি করল এই গাড়ীগুলোতে। তারপর ফোমিনের কাছে গেল পরবর্তী আদেশের জন্য।

সে সময় ফোমিন ছিল শ্বেত প্রাসাদের সেলারে, প্রশ্ন করছিল তখনই ধরা-পড়া একজন জার্মান অফিসারকে। লোকটা ৪৫ নং পদাতিক ডিভিসনের গোয়েন্দা বিভাগের লেঃ কর্ণেল

বলে জানা গেল। তার ব্যাগের ভিতর দুর্গের বিস্তারিত নক্সার সঙ্গে পাওয়া গেল সোভিয়েত সেনাপতিমণ্ডলীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কাগজপত্র। কমিশার ভাবছিল কি করে এই কাগজ ডিভিসনের হেডকোয়ার্টারে পাঠান যায়। এমন সময় তাকে খবর দেওয়া হল সাঁজোয়া গাড়ী কয়টি প্রস্তুত। স্থির হল তিনটি সাঁজোয়া গাড়ী ব্যূহ ভেদ করে সহরে যাবার চেষ্টা করবে, এর পরিচালক হবে রেজিমেণ্টের কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারী, কমিশারের সহকারী এবং সহকারী রাজনৈতিক সংগঠক মাতেভোসিয়ান। ধরা-পড়া দলিলপত্র হেডকোয়ার্টারে পেঁছে দেবার ভারও ফোমিন তাকে দিল।

মাতেভোসিয়ানকে আর সহকারী রাজনৈতিক সংগঠক বলে মনে করা হল না। সে এখন রেজিমেণ্ট কমিশার। ফোমিনের কাছে একটা বাড়তি টিউনিক ছিল, এর কলারের পট্টিতে রেজিমেণ্ট কমিশারের পরিচয় চিহ্ন। ফোমিন কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারীকে এই টিউনিকটি পরতে বলল। মাতেভোসিয়ান পোষাকটা পরতে আপত্তি জানালে ফোমিন বুঝিয়ে বলল কেল্লায় অফিসারের সংখ্যা খুবই কম, ওদের ভিতর আর একজন উঁচু পদের অফিসার আছে জানলে লোকরা বেশী আশ্বস্ত বোধ করবে। কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারীকে দলপতির নির্দেশ মেনে নিতে হল। হঠাৎ এই পদোন্নতির পর মাতেভোসিয়ান ৮৪ নং রেজিমেণ্টের প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের পরিচালনা করছিল। আর এখন ফোমিনের দেওয়া আর একটি

বিপজ্জনক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার পেল সে, ডিভিসনের হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে।

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় কমিশার ফোমিন আবেগভরে মাতেভোসিয়ানকে জড়িয়ে ধরল। সামনের গাড়ীটিতে চাপল মাতেভোসিয়ান। মেশিনগানের গুলি চলেছে। তারই ভিতর দিয়ে তিনটি গাড়ী পুল ধরে ছুটে চলল দুর্গের বাইরের দিককার উত্তরের গেটে। তখন লড়াই চলছিল গেটের চারপাশে। গেটের টানেলটা বন্ধ হয়ে গেছে একটা জ্বলন্ত জার্মান গাড়ীতে। মাতেভোসিয়ানের আদেশে সাঁজোয়া গাড়ী তিনটি মোড় নিল বাঁয়ে উত্তর-পশ্চিম গেটের দিকে, কিন্তু সেখানেও একই অবস্থা। বাকি শুধু সহরের সবচেয়ে কাছে পূব দিকর্কার কোব্রিন্‌স্কি গেট। কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারী তার ড্রাইভারকে দ্রুত সেদিকে গাড়ী চালাতে বলল।

গেটের দিকে রাস্তাটা গেছে ১২৫ ও ৩৩৩ নং পদাতিক রেজিমেণ্টের অফিসারদের কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে। দূর থেকে মাতেভোসিয়ান আর তার লোকেরা দেখতে পেল বাড়িগুলোর চারপাশে লড়াই চলেছে। জার্মান সাবমেশিনগানচালকরা অর্ধবৃত্তাকারে এগিয়ে আসছে, জানলাগুলোর ওপর ক্রমাগত গুলি চালাচ্ছে। জবাবে বাড়ির ভিতর থেকে গুলি আসছে মন্থরভাবে ও থেকে থেকে।

সাঁজোয়া গাড়ীগুলো একসঙ্গে ঘুরে সমস্ত মেশিনগান ছুড়তে ছুড়তে জার্মানদের পিছনদিকে আঘাত হানল। কয়েক মিনিটের ভিতর সাবাড় হল ফ্যাশিস্ট সৈন্যদল। বাড়ির ভিতরকার

অবরুদ্ধ লোকগুলি সানন্দে দরজা জানলা দিয়ে ছুটে এল পরিত্রাণকারীদের দিকে। অফিসার ও সৈন্যের সংখ্যা সামান্য, বাকি সবাই নারী ও শিশু।

মাতেভোসিয়ান গাড়ী থেকে লাফিয়ে নাবতেই একটি তরুণী সর্বপ্রথম এসে হাজির হল তার কাছে। তার ফুল-আঁকা সিল্কের পোষাকটি গেছে ছিঁড়ে, গালের উপর বুলেট ক্ষত থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে, হাতে ধরা একটা জার্মান সাবমেশিনগান। মাতেভোসিয়ানের হাত সে চেপে ধরল, এইমাত্র যে লড়াই হয়ে গেছে তারই উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

'কমরেড কমিশার, কী করব আমরা? আমাদের গোলাবারুদ নেই বললেই চলে।'

কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারীর চার পাশে আর সবাই এসে ভীড় করল, কেল্লার অবস্থা সম্পর্কে রাশি রাশি প্রশ্ন করতে লাগল। এদের ভিতর ছিল একজন ক্যাপ্টেন, কপালে রক্তের ছোপওলা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, মেয়েরা উদ্বিগ্ন হয়ে বাচ্চাদের বুকে জড়িয়ে আছে, অন্য মেয়েদের হাতে অস্ত্র, এক বালকের হাতে কাঠের লম্বা হাতলওয়ালা একটা জার্মান হাতবোমা, অর্ধনগ্ন সৈনিকদের হাতে রাইফেল।

লোকগুলিকে আশ্বস্ত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করল মাতে-ভোসিয়ান, ওদের পরামর্শ দিল কেন্দ্রীয় দ্বীপে যেখানে প্রতিরোধের হেডকোয়ার্টার অবস্থিত সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা করতে। জোর করে ওদের জানাল উদ্ধারকারী সৈন্য পৌঁছতে দেরী নেই, শত্রুকে খতম করা ও পিছু হঠান হবে। ক্যাপ্টেনকে



ব্রেস্ত দুর্গের রক্ষীরা
শিল্পী ক্রিভনগভের চিত্র থেকে

দলের ভার দিয়ে সে ফিরে এল সাঁজোয়া গাড়ীতে। তিনটি গাড়ী আবার সগর্জনে ছুটে চলল কোব্রিন্‌স্কি গেটের দিকে।

কিন্তু লড়াই চলছিল ওখানেও। গেট বন্ধ ৯৮ নং গোলন্দাজ ব্যাটালিয়নের ভাঙ্গাচোড়া ট্যাঙ্ক আর কামানে। কেল্লা থেকে বার হবার কোন রাস্তা নেই।

মাতেভোসিয়ানকে ফিরে আসতে হল। তিনটি সাঁজোয়া গাড়ী নিয়ে শ্বেত প্রাসাদে ফিরে ফোমিনকে তার অকৃতকার্যতার কথা জানাল।

রাত পর্যন্ত পথ খুঁজে বার করার চেষ্টা বন্ধ রাখা সাব্যস্ত হল। মাঝে মধ্যে যুদ্ধবিরতির ফাঁকে দূরবর্তী লড়াইয়ের যে আওয়াজ এসে কেল্লায় পেঁাছেছে তার থেকে ওরা সহরে ও আশেপাশে কী ঘটছে তখনকার মত আন্দাজ করল। প্রথম দিনটিতে সারাক্ষণ ধরে যুদ্ধের আওয়াজ শোনা গেল কখনও কাছে, কখনও দূরে। কেল্লার সর্বত্র সোভিয়েত সৈন্যের আগমন সম্পর্কে গুজব ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ল, দ্বিগুণ উৎসাহে লড়াই করার উত্তেজনা পেল প্রতিরোধকারীরা।

দিনভর জার্মান বিমান বাহিনী আকাশ জুড়ে রইল, 'জাঙ্কার্সগুলো' কেল্লার উপর অবিরাম ছোঁ মেরে ফেলতে লাগল বোমা। দু'তিন বার দেখা দিল সোভিয়েত জঙ্গী বিমান। শত্রুদের প্রাধান্য সত্ত্বেও ডানার উপর লাল তারা দেখে দুর্গের লোকরা আনন্দোল্লাস জানাল। দিনের প্রথম ভাগে গোলাবারুদ ফুরিয়ে-যাওয়া ছোট্ট একটা সোভিয়েত 'চাইকা' হঠাৎ সামনের দিকে ছুটে এসে ব্রেস্ত বিমান ঘাঁটির উপর

শত্রু বিমানে ধাক্কা মারল। শ্বেত প্রাসাদের প্রাঙ্গণে মোতায়েন লোকগুলি এই লড়াই দেখছিল, সোভিয়েত বৈমানিকের এই দুঃসাহস দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। বৈমানিকের বীরের মত এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা শত্রুর উপর মারাত্মক গুলি চালাতে লাগল। আধঘণ্টা বাদে একটা শত্রু বিমান যখন ওদের উপর গুলি ছোড়ার জন্য ছোঁ মারল, পদাতিকরা ওটাকে তাক করে ক্রমাগত রাইফেলের গুলি ছুঁড়ল। জ্বলন্ত বিমানটা কোনরকমে পশ্চিম দ্বীপের গাছের চুড়ো প্রায় ঘেঁষে বুগের অপর পারে ভেঙে পড়ল। দেশরক্ষার মহান যুদ্ধে মৃত্যুবরণকারী যে বীর বৈমানিক সর্বপ্রথম শত্রুবিমানকে ধাক্কা মারে এই ভাবে ৮৪ নং রেজিমেণ্টের রাইফেলধারীরা তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়। এরাও যুদ্ধের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম রাইফেলের গুলি দিয়ে শত্রু বিমান ভূপাতিত করল।

ঐ একই দিনে আর একটা ফ্যাশিস্ট বিমানকে গুলি চালিয়ে মাটিতে ফেলা হয়। এটাকে ফেলে বিমান-ধ্বংসী কামানচালকরা। তাদের কামানগুলো পূব গড়ের কাছে। প্রতিরোধীরা জয়োল্লাস ধ্বনি করে উঠল যখন সরাসরি গোলার আঘাতে প্রকাণ্ড বিমানটা জ্বলন্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে গেল অফিসার কোয়ার্টারের পিছনে। বাকি শত্রু বিমানগুলো কিন্তু তীব্র আক্রমণ চালাল বিমান-ধ্বংসী কামান ঘাঁটির উপর। দেখতে দেখতে একটা কামান শেষ হয়ে গেল, মারা পড়ল বহু লোক। দলপতি সাঙ্ঘাতিক আহত হয়েও নিজের জায়গা

ছাড়ল না। যাই হোক, বোমারু বিমানটা খতম হওয়ায় শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে উঁচুতে উড়তে বাধ্য হল।

প্রথম দিন কেটে গেল প্রত্যাশায়। অবরোধ শেষ হবে এ আশা পূর্ণ হল না। রাত আসতেই কম্যান্ডাররা সহরে টহলদারের দল পাঠাবার চেষ্টা করতে লাগল নূতন করে।

কিন্তু শত্রু দুর্গ বাঁধের পিছনে সরে গেলেও সতর্ক থাকল। অবরোধের সীমা বরাবর অবিরাম রকেট ফ্লেয়ার চলতে লাগল, বাঁধের উপর পড়তে লাগল শত্রুর সন্ধানী আলো, প্রতিরোধকারীদের চলাচলের উপর কড়া নজর রাখল শত্রুপক্ষ। টহলদারদের কেউই বাঁধ পেরুতে পারল না, কারণ চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের উপর পড়তে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি।

৮৪ নং রেজিমেণ্টের অঞ্চলে ফোমিনের দু'জন সৈন্য কেন্দ্রীয় দ্বীপের পূব দিক দিয়ে জলে নেবে মুখাভেৎস্ সাঁতরে চলতে লাগল, কিন্তু অপর তীরে যেখানে ওদের ওঠার কথা সেখানে প্রচণ্ড গুলি চলতে লাগল। সবাই বুঝল হয় ওরা মারা পড়েছে বা শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে। ফোমিন এরকম চেষ্টা ছেড়ে দেবে ভাবছিল, এমন সময় কমসমল সদস্য বেতারপ্রেরক মিখাইলভ্স্কি জলের তলা দিয়ে পথ বার করার একটা নূতন ফন্দী বাৎলাল।

কয়েক জন লোক পরল শ্বাসজালি, এর বাক্স থেকে নম্য বায়ুনল খুলে ফেলে অন্য অনেকগুলোর সঙ্গে লাগান হল এবং এভাবে তৈরী নলের শেষে ছোট্ট কাঠের ফাৎনা জুড়ে

দেওয়া হল। এরপর লোকগুলি পায়ে ইঁট বেঁধে সতর্কভাবে নদীতে নাবল। কাঠের ফাৎনায় জলের উপর ভেসে থাকা নলের ভিতর দিয়ে শ্বাস টেনে পিছল ও বন্ধুর নদীর তলা দিয়ে উজান বেয়ে এগুতে লাগল তারা। ইতিমধ্যেই তারা দুর্গ পেরিয়ে গেছে, রাস্তা বার করতে পারবে বলে বিশ্বাস হল ওদের, কিন্তু এমন সময় জলের তলায় আচমকা এক বাধা তাদের পথ রোধ করল। নদীর এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা শক্ত লোহার জাল লাগান।

একজন ভাবল জলের উপরে উঠে লোহার জাল পেরুবে। কিন্তু ওর মাথা উপরে উঠতেই ক্রমাগত রকেট ফাটার ঝলসানিতে সেটা নজরে পড়ল, দুই পার থেকে মেশিনগানের গোলা ছুটল ওটার উপর, স্পষ্টই বোঝা গেল জালটাকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ মেশিনগান বসান হয়েছে। ওরা বুঝল বাধাটা পেরিয়ে এগুবার উপায় নেই, তাই ফিরে এল নিজেদের ঘাঁটিতে।

পরে বন্দী জার্মান সৈন্যেরা দুর্গরক্ষীদের বলেছিল জালটা ওখানে এল কী করে। শত্রুদলের কর্তারা শংকা করেছিল অবরুদ্ধ সৈন্যদল হয়ত নৌকাযোগে সাহায্য পাবে, তাই প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই জার্মান ইঞ্জিনিয়াররা নদীর নীচে জাল পাতে, সেটা পাহারা দেয় দুই তীরের ওপর রাখা দুটো মেশিনগান।

ডুবুরিরা ফিরে আসায় সহরের সঙ্গে যোগাযোগের শেষ আশাটুকুও লুপ্ত হল। যতক্ষণ না বাইরে থেকে সোভিয়েত সৈন্য শত্রুর অবরোধ ভেঙে দেয়, ওদের অপেক্ষা করা ছাড়া

উপায় রইল না। কারুই অবশ্য এ সন্দেহ ছিল না যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এটা ঘটবে।

কিন্তু রাত গেল কেটে, এল রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত। গতকাল সহরের দিক থেকে গোলাগুলির যে জোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল তা এখন পুবে সরে গিয়ে খুবই ক্ষীণভাবে কানে আসছে। দিনের শেষে কোন সাড়া শব্দই পাওয়া গেল না। দুর্গরক্ষীরা বুঝল শত্রু চাপ দিয়েছে, দুর্গ থেকে সরে গেছে ফ্রণ্ট লাইন। এই প্রথমবার তারা বুঝতে শুরু করল পিছিয়ে-পড়া সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী সামলে উঠে পাল্টা আক্রমণ চালান পর্যন্ত বহুদিন ধরে তাদের লড়াই চালাতে হবে। এই ভয়ংকর ও অসম যুদ্ধের দরুণ যে সাংঘাতিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে তার জন্য প্রতিটি লোক মনে মনে প্রস্তুত হয়ে উঠল।

কিন্তু এত সব ভাববার সময় বিশেষ ছিল না। ভোর হতেই শত্রুর কামান আবার গর্জে উঠল, 'জাঙ্কার্সগুলো' ছোঁ মারতে লাগল দুর্গের উপর। রাত্রিতে বিশ্রাম নিয়ে এবং দল ভারি করে শত্রুর হানাদারী সৈন্য চারদিক থেকে নূতন শক্তিতে আক্রমণ চালাল। প্রতিরোধকারীদের বর্তমানে একমাত্র কাজ হল নিজেদের সামলে রেখে শত্রুর হামলা হঠাতে থাকা। গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণ ও নূতন আক্রমণের মাঝে মাঝে সামান্য বিরতির মধ্যে শুধু সেই মুহূর্তে কান খাড়া করে পূবের দিকে গোলাগুলির গুরু গুরু ধ্বনি শোনে।

ব্রেস্ত অঞ্চলের ফ্রণ্টে কিন্তু গত দু'দিন ধরে শোচনীয় ব্যাপার ঘটে চলেছে।

লড়াইয়ের প্রথম কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই ব্রেস্ত শত্রুর হাতে আসে। ভোরের সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উপর গোলা আর বোমা ফাটতে থাকে, বাড়িঘর জ্বলতে জ্বলতে ভেঙেচুড়ে যায়, জার্মান অন্তর্ঘাতকরা চিলেঘর থেকে গুলি ছোড়ে, সহর থেকে প্যালিয়ে-যাওয়া অসামরিক লোকদের উপর শত্রুবিমান ছোঁ মেরে গুলি চালায়, রাস্তা ঘাটে সরিয়ে-না-দেওয়া মৃতদেহ পড়ে থাকে, পৌর হাসপাতাল আহতে ভর্তি হয়ে যায়। পৌর প্রতিষ্ঠান আর ইউনিটগুলোর হেডকোয়ার্টার পূবে কোব্রিনের দিকে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। কিছু সময়ের মধ্যেই এগিয়ে-আসা জার্মান সৈন্য কোব্রিনের দিকে মস্কোর রাস্তা আটকে ফেলে। আর সাবমেশিনগানচালকরা যারা মুখাভেৎস্ পেরিয়ে আসে, হাজির হয় সহরের দক্ষিণাঞ্চলে। জ্বলন্ত রাস্তায় হিটলারী সৈন্য বেপরোয়া হত্যা, বলাৎকার আর লুণ্ঠন চালাতে থাকে, সঙ্গে যোগ দেয় বন্দীশালা থেকে ফ্যাশিস্টদের খালাস-দেওয়া অপরাধীর দল।

এখানে সেখানে সশস্ত্র ব্রেস্ত কমিউনিস্টের দল প্রতিরোধ গড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের বেশীর ভাগকেই অসংখ্য জার্মান সাবমেশিনগানচালকরা হয় ভেঙে দেয় বা সাবাড় করে। সহরে মাত্র দুটি প্রতিরোধ ঘাঁটি ছিল। এদের চূর্ণ করতে শত্রুর দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

আঞ্চলিক সামরিক কমিশারিয়েট দখলের জন্য বহু ঘণ্টা

ধরে শত্রু লড়াই চালায়। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সংগঠনের ত্রিশ বা চল্লিশজন কর্মী তাদের পরিবারসহ ভোরে আসে কমিশারিয়েটে। অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হয় এদের, দরজা জানলা আটকে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা হয়। আঞ্চলিক সামরিক কমিশার স্তাফেইয়েভের নেতৃত্বে বাড়ির চারপাশে এরা প্রতিরোধের জন্য মোতায়েন হয়। সহরে ঢুকেই জার্মানরা কমিশারিয়েট আক্রমণ করে। ওরা গুঁড়ি মেরে বাড়িটির কাছে এগিয়ে এসে জানলার ভিতর দিয়ে হাতবোমা ছোঁড়ে। মাথার উপর চক্কর দেওয়া 'জাংকার্সগুলো' থেকে বোমা পড়তে থাকে আতঙ্কজনকভাবে কাছাকাছি। কিছু কিছু প্রতিরোধকারী মারা পড়ে, কেউ কেউ আহত হয়। কমিশারিয়েটের ডাক্তার তাদের ক্ষত চিকিৎসা করার বিশেষ সময় পেল না। এরপর কমিশার স্তাফেইয়েভ নিজেই গুরুতর আহত হল, কিন্তু দাঁড়াতে না পারলেও সে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগল।

আর কোন আশা নেই দেখে প্রতিরোধকারীরা স্থির করল দুপুরবেলা নারী ও শিশুদের বাড়ি থেকে বার করে দেবার চেষ্টা করে নিজেরা শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবে। কিন্তু সাদা নিশান হাতে নারী ও শিশুরা দরজা দিয়ে বার হতেই শত্রু সাবমেশিনগান চালাল, অনেকেই মারা পড়ল বা আহত হল।

একেবারে সেই সন্ধ্যায় যখন গোলাবারুদ একেবারে শেষ হয়ে গেল, তখনই কেবল জার্মানরা কমিশারিয়েটের প্রতিরোধ ঘায়েল করতে পারল। কমিশার স্তাফেইয়েভ ও আহত কয়েকজন লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করা হল, কিছু লোককে নেওয়া

হল বন্দী হিসেবে। মাত্র কয়েকজন শত্রুব্যূহ ভেদ করে পিছনের গলি দিয়ে সহর থেকে পালিয়ে যেতে সমর্থ হল।

ব্রেস্তের উত্তরাঞ্চলে স্টেশনে কিন্তু এর চাইতেও জবরদস্ত লড়াই চলেছিল।

শনিবার ২১শে জুন সন্ধ্যায় প্রুজানি-গামী বিমান বাহিনীর ছোট্ট একটি দল উপস্থিত হল ব্রেস্ত স্টেশনে। এদের দুটি পল্টনে ছিল পঞ্চাশজন লোক। দলের নেতা সার্জেণ্ট-মেজর বাসভ। সামরিক কম্যাণ্ডাণ্ট সন্ধ্যার গাড়ীতে গন্তব্যস্থলে এদের পাঠাতে পারল না, তাই ওদের স্টেশনঘরে রাত কাটাতে বলল।

বোমাবর্ষণ শুরু হতেই সার্জেণ্ট-মেজর তার লোকগুলিকে একত্র করে স্টেশনের চারপাশে মোতায়েন করল যাতে পূবে গামী ট্রেনগুলিকে রক্ষা করা যায়। সৈনিকদের কাছে কার্তুজ খুব কমই ছিল কিন্তু স্টেশনের মাটির তলার ঘরে আধা-সামরিক রেলরক্ষীদের জন্য রাখা কিছু গোলাবারুদ আবিষ্কার করা গেল। এখন বাসভের দল অনেকক্ষণ রুখতে পারবে।

অল্পসময়ের মধ্যে বুগ থেকে পিছিয়ে-আসা কিছু সীমান্তরক্ষী এদের সঙ্গে যোগ দিল। একটু বাদেই স্টেশনে আসার রাস্তায় দেখা দিল একদল জার্মান মোটর-সাইকেল দল। প্রতিরোধকারীরা ওদের কাছে আসতে দিল, তারপর মারাত্মক গুলি ছুঁড়ে এদের বেশীর ভাগকেই সাবাড় করল।

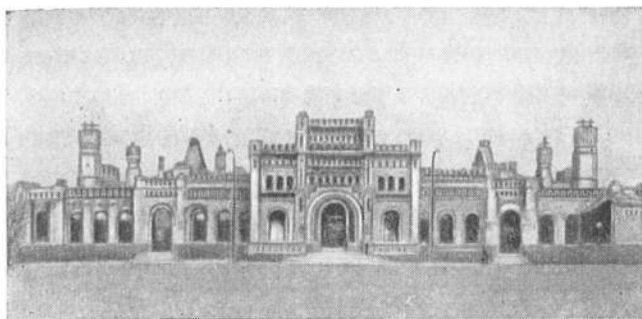
মোটর-সাইকেলের পিছনে এল সাবমেশিনগানচালক সাঁজোয়া বাহিনী। শত্রুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। বাসভের

ক্ষুদ্র দলটি বাধ্য হল স্টেশন বাড়িতে পিছিয়ে যেতে। ওখানে কয়েকশত আশ্রয়প্রার্থী অপেক্ষা করছে পূব গামী ট্রেনে যাবার আশায়।

মাথার উপর চক্কর দেওয়া জার্মান বিমান থেকে বোমা পড়তে লাগল, দালানটা ক্রমশ ধ্বংস হল। স্পষ্টই বোঝা গেল স্টেশন বাড়িতে থেকে প্রতিরোধ চালান যাবে না। অন্য দিকে মাটির তলার প্রশস্ত ঘর বোমার হাত থেকে আশ্রয় হিসেবে ভাল এবং চারদিক থেকে প্রতিরোধের ব্যবস্থার পক্ষে সুবিধের। স্টেশন ছেড়ে সবাই নেমে গেল অন্ধকার সেলারে। মেশিনগান আর রাইফেলধারীদের বাসভ মোতায়েন করল ভিত্তি প্রাচীরের জানলায়। শত্রু যেমনি বাড়ির দিকে এগিয়ে এল প্রতিরোধকারীদের তাকসই গুলিতে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হল, শত্রু সৈন্যের অনেকে মারা পড়ল। জার্মানরা বাধ্য হল রীতিমত অবরোধ ব্যবস্থা করতে, কারণ স্টেশনের মাটির নীচের ঘরগুলো ছোটখাট দুর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবরোধকারীদের অবস্থা কিন্তু খুবই সাঙ্ঘাতিক। খাবার তাদের নেই বললেই চলে। স্টেশন বুফেতেও যথেষ্ট খাদ্য নেই, অতগুলি লোকের একদিনের মত খাবারেরও অভাব। তাই সার্জেণ্ট-মেজর বাসভ স্থির করল সব অসামরিক লোকদের সেলার থেকে বেরিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ব্যতিক্রম শুধু কমিউনিস্টরা। তাদের অস্ত্র দেওয়া হল প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য।

দীর্ঘ ও শক্তিক্ষয়কারী সংগ্রাম শুরু হল। জার্মানরা



ব্রেস্ত রেল স্টেশন

স্টেশনে ঢুকল, কিন্তু সেলারগুলোতে পেঁছতে পারল না। প্রতিটি গর্ত আর সেলারের সরু জানলা থেকে শত্রুর চলাচলের উপর সোভিয়েত সৈন্য তীক্ষ্ন নজর রাখল। প্রতিদিন প্রচুর শত্রুসৈন্য মারা পড়তে লাগল বাসভের লোকদের বুলেট খেয়ে।

রোজই জার্মান যুদ্ধ পরিচালকরা লাউডস্পীকার দিয়ে স্টেশন প্রতিরোধকারীদের আত্মসমর্পণের আবেদন জানাল, বলল তাদের হত্যা করা হবে না। কিন্তু একমাত্র জবাব এল ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি।

তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে জার্মানরা সেলারটাকে জল দিয়ে ভরাট করতে চেষ্টা করল, হোস পাইপ দিয়ে জল দিল ছেড়ে। কিছু সময়ের মধ্যেই বাসভ ও তার লোকেরা কোমর অবধি জলে ডুবে গেল। কিন্তু গুলি ছোড়া বন্ধ করল না। জার্মানরা

সত্বর বাধ্য হল এই ফন্দীটি ছাড়তে, কারণ সহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেছে। সেলারগুলিকে একতলা সমান ভর্তি করার মত যথেষ্ট জল কাছাকাছি কোথাও নেই।

এরপর শত্রু আর এক নতুন মৎলব আঁটল। সেলারের দরজা ও অন্যান্য ফাঁকফোকর যা নজরে পড়ল সব আটকে দিয়ে তারা ভিতরে চালান দিল বিষাক্ত গ্যাস। অনেকেই দম আটকে মারা গেল, কিন্তু যারা বেঁচে রইল চালাতে লাগল অসম লড়াই।

পেট্রোল ঢেলে সেলারগুলোকে জ্বালিয়ে দেবার চেষ্টাও হল ব্যর্থ। শেষ পর্যন্ত ফ্যাশিস্টরা ঠিক করল স্টেশনে আনা লরিভর্তি নর্দমার ময়লা দিয়ে সেলারটা বোঝাই করবে।

এই নারকীয় সংগ্রাম চলে দু'সপ্তাহ ধরে। প্রায় সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে অভুক্ত ও শ্রান্ত মানুষগুলি কোমর বা গলা পর্যন্ত দুর্গন্ধ ময়লা জলের ভিতর দিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল, কিন্তু রাইফেল তারা ছাড়ল না। শত্রুর আত্মসমর্পণের আবেদনের জবাবে আগের মতো চালাত গুলি। লড়াইয়ের মাঝে মাঝে বিরতির সময় তারা দুর্গ থেকে আসা কামান ও রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেল। কাছেই তাদের কমরেডরা যে দুর্ধর্ষ লড়াই চালাচ্ছে এই জেনে এত কষ্টের মধ্যেও নূতন শক্তি পেল।

পয়লা জুলাই বাসভ ও তার সঙ্গে কয়েকজন শত্রুর বেষ্টনী ভাঙবার চেষ্টা করল। রাতে তারা একটা দরজা ভেঙে ফেলে উপরে উঠল। জার্মানরা এটাকে আটকে দিয়েছিল।

নীচের লোকরা শুনতে পেল মাথার উপর হাতবোমা ফাটছে, গুলি চলছে। দলের কেউ ফিরে এল না। ওরা শত্রুর বেষ্টনী ভাঙতে পেরেছে বা সেই অসম যুদ্ধে মারা গেছে সে-কথা কোনদিনই জানা যায়নি।

জুলাইয়ের দশ তারিখে কয়েকটি লোক সেলারে বেঁচে ছিল। এক রাত্রে সেখানে মৃত ব্রেস্ত নাগরিকের পোষাক পরে স্টেশনের সেই শেষ রক্ষী ক'জন সাবধানে সেলার থেকে বেরিয়ে আসে, রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে জঙ্গল আর জলাভূমির রাস্তা ধরে পূবে ফ্রণ্ট লাইনে চলে যায়। এই ভাবে শেষ হয় সেই বীরোচিত সংগ্রাম।

ইতিমধ্যে ফ্রণ্ট দূর থেকে আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ছে। সোভিয়েত সৈন্যের বেশীর ভাগকেই সবেমাত্র সেনাদলে ভর্তি করা হয়েছে, লড়াইয়ে ওরা অনভিজ্ঞ। শত্রুর আচমকা আক্রমণে ওরা টাল সামলাতে পারল না। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এবং যুদ্ধ-পক্ক জার্মান সৈন্যের হামলা ওরা রুখতে অসমর্থ। আলাদা আলাদা রেজিমেণ্ট বা ডিভিসনের একরোখা ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও কখনো এখানে, কখনো ওখানে ফ্রণ্টে ভাঙ্গন ধরল, ঘেরাও হল পিছু-হটা সৈন্যদল। গুদেরিয়ান ও গট্‌টের ডিভিসনগুলো ইতিমধ্যেই সোভিয়েত ইউনিটগুলোর পিছনে গভীরে ঢুকে গেছে। ওরা চেষ্টা করছে সীমান্ত অঞ্চল থেকে লড়াই করতে করতে পিছিয়ে-আসা সোভিয়েত ইউনিটগুলোকে 'সাঁড়াশি অভিযানে' পিছন থেকে চেপে ধরবে। প্রতিদিনই শত্রু সৈন্যবাহিনী বেশী করে দেশের অন্তস্থলে ঢুকতে লাগল।

শত্রুকে রুখতে কমিউনিস্ট পার্টি, সৈন্যবাহিনী ও সোভিয়েত জনগণকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে বহু মাস ধরে লড়াই চালাতে হয়েছিল। একমাত্র শীতের সময় পূব দিকে অনেক দূরে মস্কোর প্রবেশ মুখে শত্রুকে ওরা রুখে দেয়।

কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর পরবর্তী জয়সমূহের মত ভবিষ্যতে মস্কোতে যে জয় হয় তার পত্তন বেলোরুশিয়া, বাল্টিক তীর ও উক্রেনে ১৯৪১ সালের সেই মর্মান্তিক অথচ বীরত্বপূর্ণ দিনগুলিতে। এর পত্তন যারা করে তারা নামহীন শত শত সৈনিক। এরা প্রাণ দেয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে, ঘেরা পড়েও দুর্ধর্ষ সংগ্রাম চালায়। লড়াই করতে করতে শত্রুর পিছন দিক থেকে ফ্রণ্ট লাইনে এগিয়ে যায়, কিংবা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর পিছনে প্রচণ্ড লড়াই চালিয়ে তার সঙ্গে দেশের অন্তস্থলে সরে আসে। এদের বুলেট ও হাতবোমায়, গোলা ও মাইনে, শত্রুর উপর প্রতিশোধাত্মক আক্রমণে ফ্যাশিস্ট দস্যুদের প্রথম কয়েক লক্ষ সৈন্য সাবাড় হয়। এরা হল হিটলারের বাছাই করা সৈন্য। এই ভাবে ভবিষ্যৎ জয়ের তারা গোড়া পত্তন করে।

একমাত্র বিশাল ফ্রণ্ট বরাবরই লড়াই চলে না, সংগ্রাম চলে দেশের গভীরে অগ্রগামী জার্মান ট্যাঙ্ক বহর থেকে শুরু করে একেবারে সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত। সেখানে আটক-পড়া সৈন্যদল তখনো লড়াই চালাচ্ছে, এবং পার্টিজানের প্রথম দলগুলি ইতিমধ্যেই সংগ্রাম চালাতে শুরু করেছে।

বিশাল সোভিয়েত রাষ্ট্রের যুদ্ধ চৌকি, আমাদের প্রতিরোধের সামনের ঘাঁটি হিসেবে বুগের তীরে প্রাচীন রুশী কেল্লার প্রাচীরের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্যারিসন অতুলনীয় মনোবল ও সাহস নিয়ে লড়াই চালাতে থাকে।

যুদ্ধের দিন আর রাত

সারা রাত ধরে রকেট ঝলকানির মৃদু প্রভায় নিঃশব্দ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলল কেল্লায়। মাঝে মাঝে শত্রু কামানের গোলাবর্ষণ বিরক্তিকর ছাড়া আর কিছুই নয়। সাবমেশিনগানচালকদের আক্রমণ বন্ধ, এমনকি কোন কোন জায়গায় জার্মানিরা বাঁধের বাইরে সরে গেছে। এই অবসর-টুকুর সুযোগ নিয়ে সৈন্যদলের নেতারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরীক্ষা করে লোকদের যথাস্থানে মোতায়েন করল এবং তাদের হাতে যা ছিল সে অনুযায়ী অস্ত্রশস্ত্র ভাগ করে দিল। এরা বুঝেছিল পরের দিন আরও সাংঘাতিক আক্রমণ আসবে। রোদ ও যুদ্ধের আগুনে পোড়া শুকনো মাটিতে মৃত কমরেডদের কবর দেওয়া হল। মৃত শত্রুসৈন্যের অস্ত্রশস্ত্র ও বুলেটগুলি সংগ্রহ করা হল, ধ্বংসপ্রাপ্ত অস্ত্রাগার ও গুদামঘর থেকে গোলাবারুদ খুঁড়ে বার করা হল।

আশেপাশের দলগুলি দিনের বেলা কেল্লার মধ্যে শত্রুর সাবমেশিনগানচালকদের আক্রমণে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন



ক্যাপ্টেন ইভান জুবাচিওভ

হয়ে পড়েছিল। পরের দিন একযোগে আক্রমণ করার পরিকল্পনার জন্য এখন তারা আবার নূতন করে যোগাযোগ করতে পারল। ৪৫৫ নং পদাতিক রেজিমেণ্টের লেঃ আনাতলি ভিনোগ্রাদভ জনা ত্রিশ চল্লিশ সৈন্য নিয়ে বৃত্তাকার ব্যারাকের উত্তরাঞ্চল রুখছিল। সে এখন কমিশার ফোমিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। কেন্দ্রীয় দ্বীপের পশ্চিম অংশে ৪৪ নং রেজিমেণ্টের প্রতিরোধ পরিচালনা করছিল ক্যাপ্টেন ইভান জুবাচিওভ। সেও ফোমিনের কাছে একজন দূত পাঠাল।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে তেরেস্পল্ গেট এলাকায় সোভিয়েত সৈন্য পুনর্গঠিত হল। লেঃ কিজেভাতভ পরিচালিত সীমান্তরক্ষীরা তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত চৌকি ছেড়ে ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিল। পরে এই এলাকার রক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আন্দ্রেই কিজেভাতভ লেঃ পতাপভ ও সানিনের সঙ্গে হাত মেলাল। রাতে কম্যাণ্ডাররা

৮৪ নং রেজিমেণ্টের কাছে দূত পাঠাল, কিছু সময়ের মধ্যেই ফোমিনের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে তাদের যোগাযোগ হল। ফোমিন শ্বেত প্রাসাদের সেলারে তার হেডকোয়ার্টার বানিয়েছিল। এ কথা সত্যি যে এই টেলিফোন লাইনটি যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য হয়নি। বেশীক্ষণ টেঁকেওনি, কারণ কেল্লা প্রাঙ্গণে জার্মান বোমায় বার বার এটা কেটে যায়।

প্রতিরোধকারীরা ক্লান্ত। রাতে ওরা প্রায় ঘুমোয়নি বললেই চলে। পালা করে কেউ কেউ একটু ঝিমিয়ে নিল আর সেই সময় বাকি কমরেডরা সতর্ক দৃষ্টি রাখল যাতে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে শত্রু না আচমকা আক্রমণ করে বসে। কিন্তু সে রাতে স্পষ্টই মনে হল জার্মান সমর পরিচালকরা তাদের পদাতিক বাহিনীকে বিশ্রাম দিতে চায় কারণ দিনের লড়াই ওদের একেবারে পরিশ্রান্ত করে ফেলে। শত্রু তার হ্রাস-পাওয়া হানাদার সৈন্যদলকে নূতন লোক দিয়ে শক্তিশালী করে, আরও সৈন্য নিয়ে আসে, আহতদের সরিয়ে ফেলে এবং ওরাও ওদের দলের মৃতদেহগুলোকে কবর দেয়। রাতটা অপেক্ষাকৃত শান্তিতে কাটল।

কিন্তু ভোর হতেই লড়াই আবার সুরু হল দ্বিগুণ তেজে। ঊষার প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গেই কেল্লাঘেরা কামান থেকে শত্রু গোলন্দাজ বাহিনী গোলা ছুড়তে লাগল বেষ্টনীর মাঝখানে আর ছোঁ-মারা বোমারু বিমান রক্ষীদের উপর সশব্দে বোমা ফেলতে লাগল। আবার সবকিছু ঢেকে গেল ধোঁয়ায়, আগুন জ্বলে উঠল বহু জায়গায়, লাইন বরাবর চলতে লাগল ফটাফট

মেশিনগান আর রাইফেলের গুলি। নূতন করে দুর্গ আক্রান্ত হল।

আবার গতকালের মত কয়েক দল সাবমেশিনগানচালক বাঁধ পেরুল, ঢুকল কেল্লার উত্তরাঞ্চলে, কেন্দ্রীয় দ্বীপে চালাল একরোখা আক্রমণ। শত্রু মুখাভেৎসের উত্তর পার দখল করে ত্রিখিলান গেটের দিকে প্রসারিত পুলের দুদিকে ঝোপের মধ্যে ঘাঁটি গাড়ল। সেখান থেকে ব্যারাকের জানলা আর গুলি চালাবার ঘুলঘুলির উপর মেশিনগান থেকে অবিরাম গুলি ছুঁড়তে লাগল। বহুবার সাবমেশিনগানচালকরা মুখাভেৎসের শাখা খাল পেরুল পায়ে হেঁটে, দখলের চেষ্টা করল কেন্দ্রীয় দ্বীপের পূব ভূখণ্ড। কমিশার ফোমিন এই অঞ্চলের রক্ষাব্যবস্থার ভার দিয়েছিল মাতেভোসিয়ানকে। ও তার সৈন্যদল নিয়ে শ্বেত প্রাসাদের প্রাচীরের পিছন থেকে সঙ্গীন আক্রমণ চালাল।

গোলাগুলির গর্জনের মাঝখানে বিউগলের ধ্বনি আক্রমণের সংকেত জানায়, মেশিনগানের খটখট আওয়াজের সঙ্গে মিশে ড্রামের গুরু গুরু ধ্বনি তালে তালে বেজে উঠে — হানাদার সৈন্যদের সঙ্গে বিউগল আর ড্রামবাদকও আক্রমণে যোগ দেয়। ধোঁয়া ও অনিদ্রায় ফোলা চোখ, ধূলো ও বারুদের ধোঁয়াভর্তি দুর্দান্ত ও মরিয়া চেহারার লোকগুলিকে দেখামাত্রই শত্রুর মনে আতঙ্ক জাগল। তাদের সোল্লাস ধ্বনি আর প্রচণ্ড সঙ্গীন চালনা শত্রুকে অবধারিত ছত্রভঙ্গ করে। কেন্দ্রীয় দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দখলে আনার শত্রুর সব

চেষ্টাই ব্যর্থ, বহু শত্রুর সাবমেশিনগানচালক সাবাড় হল সেখানে।

শত্রু খোল্‌ম্‌ গেটের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দ্বীপ থেকেও ব্যারাকের উপর আক্রমণ বন্ধ করল না, কিন্তু ফোমিনের লোকেরা নীচ আর উপরতলার জানলা থেকে তাকসই গুলি চালিয়ে এই আক্রমণের পাল্টা জবাব দেয়। এখন যে এদের আছে শুধু মেশিনগান আর রাইফেল তা নয়। একটা অস্ত্রাগার বোমার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এর ভেতরে পাওয়া গেল এক গাদা সাবমেশিনগান। সঙ্গে সঙ্গে এগুলিকে দেওয়া হল পদাতিকদের হাতে। এরই মধ্যে গোলন্দাজরা দেখতে পায় সামান্য কিছু মর্টার গোলা। তারা জানলা থেকে হাসপাতালের কাছে শত্রু সৈন্যের উপর গোলা চালায়। এমনকি এক ধরনের লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রতিযোগিতা সুরু হল। গোলন্দাজরা হাসপাতালের ছাতের স্বস্তিকা-আঁকা বিরাট পতাকার উপর গোলা চালাতে লাগল। দুবার নাজিরা পতাকা তোলে কিন্তু দুবারই সোভিয়েত গোলন্দাজরা ওটাকে গোলা মেরে সাবাড় করে।

সেদিন ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের হাতেও সাবমেশিনগান ও মর্টার আসে। আগের দিন এই দলটির গোলাগুলির রসদ প্রায় শেষ হয়ে যায়। রাতের বেলা ওরা কয়েকটা জার্মান সাবমেশিনগান আর কার্তুজের ক্লিপ জোগাড় করে। কিন্তু এগুলো বেশী সময় টেঁকার কথা নয়, তাই শঙ্কা ছিল এসব একেবারে ফুরিয়ে গেলে কী হবে।



বিউগলবাদক পেতিয়া ক্লিপা, ১৯৪১

এই রেজিমেণ্টের ব্যাণ্ডের দলে ছিল পেতিয়া ক্লিপা নামে একটি ছেলে। সে হঠাৎ অবস্থাটা সামলে দিল।

পেতিয়ার বয়স চৌদ্দ কিন্তু দেখতে এমন ছোটখাট যে দশ বার বছরের বেশী মনে হয় না। ছেলেটি চতুর চালাক, মাথায় বুদ্ধি খেলে চটপট আর সাহসটা এমনি যে দলের প্রত্যেকেরই প্রিয়পাত্র সে।

ওর বাবা ছিল পাকা কমিউনিস্ট। ব্রিয়ান্‌স্কের রেল স্টেশনের একজন কর্মী। পেতিয়া যখন খুব ছোট ওর বাবা মারা যায়। তখন বড় ভাইদের কাছে যাবার জন্য সে সৈন্যদলে যোগ দেয়। ওর দাদা লেঃ নিকলাই ক্লিপা ব্যাণ্ড পল্টনের পরিচালক, পেতিয়া বিউগলবাদক হিসেবে এই দলে ভর্তি হয়। ছোট ছেলের গর্ব নিয়ে লাল ফৌজের নূতন ইউনিফর্ম পরে সে রীতিমত সামরিক হাবভাব নিয়ে ঘুরে বেড়াত। কেল্লার সবাই ওকে জানত, ভালবাসত এই ক্ষুদে সৈনিকটিকে ওর চটপটে বুদ্ধির জন্য।

যথারীতি শনিবার সন্ধ্যায় লেঃ নিকলাই ক্লিপা কেল্লার বাইরে তার কোয়ার্টারে গিয়েছিল। এমন সময় যুদ্ধ বেধে গেল, সে আর নিজের দলে ফিরে আসতে পারল না। ঘটনাক্রমে পেতিয়া সে রাতে ছিল ব্যান্ড দলের ব্যারাকে ওর বন্ধু কোলিয়া নোভিকভের সঙ্গে। এর বয়স ষোল। দলটির পোষ্য সন্তান এও। সে রাতে হামলা শুরু হতে ওরা দুজনেই ছিল কেল্লায়।

বোমা ফাটার ফলে প্রথম কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হলেও চোখ মেলে পেতিয়া যখন দেখল তার চারপাশে কী কান্ড চলেছে সে ভড়কে গেল না। আধা-পোষাক পরা, মুখে রক্ত নিয়ে পেতিয়া একটা বন্দুক ছিনিয়ে এমন একরোখাভাবে শত্রুকে রুখবার জন্য তৈরী হল যে অফিসাররা, যে সব বয়স্ক লোকরা ঘাবড়ে গেছে, তাদের সামনে ওকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাল।

বোমার ধাক্কা দ্রুত সামলিয়ে পেতিয়া তার কম্যান্ডারদের আদেশ মেনে কাজ শুরু করল। উঁচু তলার একটা জানলায় গুঁড়ি মেরে উঠে সে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করল আর জানাতে লাগল লেঃ সানিনকে। টহলে বার হবার আদেশ পেতে সে যেতে শুরু করল সবচাইতে বিপজ্জনক জায়গাগুলোতে, সঙ্গে ওর চাইতে বয়স্ক বন্ধু কোলিয়া নোভিকভ। জার্মানিরা যখন কেল্লায় ঢোকে আর হাতাহাতি লড়াই শুরু হয় পেতিয়া তাতে যোগ দেয়, লড়াই চালায় বয়স্ক লোকগুলোর সঙ্গে।

দ্বিতীয় দিন ভোরে ছেলেদুটি লেঃ প্রতাপভের অনুমতি চাইল চারদিকটা ঘুরে দেখার। ওদের ভার দেওয়া হল বুগের তীরে শত্রুর মেশিনগান ঘাঁটির অবস্থান দেখতে।

পেতিয়া সেলারের ভিতর দিয়ে পেঁছিল তেরেস্পল্ গেটের দিকে মুখকরা একটা জানলায়। বন্ধুকে ভিতরে রেখে সে জানলা গলিয়ে সাবধানে নেমে পড়ল। গেটে পেঁছতে খোলা জায়গার উপর দিয়ে প্রায় পনেরো গজ রাস্তা। পেতিয়া গেটের দিকে ছুট মারল, কিন্তু সামনে গেটের একটি গম্বুজের উপর থেকে সাবমেশিনগানের গুলি ছোটায় সে গেল থমকে, কিন্তু অনেক দেরী হয়ে গেছে। ফেরার আর উপায় নেই। পেতিয়া চট করে ঢুকে পড়ল গেটের পাশে সবচেয়ে কাছের ব্যারাকে ঢোকার দরজায়।

বাড়িটা সীমান্তরক্ষীদের আস্তাবল। লম্বা এক সার চালা, মধ্যিখানে একটা রাস্তা দিয়ে যুক্ত। দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে পেঁছিবার জন্য এক আস্তাবল ছেড়ে আর একটায় যেতে যেতে পেতিয়া হঠাৎ এসে হাজির হল এক অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের ভাঁড়ারের সামনে। ছিমছাম তাকের উপর সাজান প্রচুর চর্বিমাখা নূতন সাবমেশিনগান। এগুলোকে কিছুদিন আগে কেল্লায় আনা হয়। ঐ সঙ্গে বাক্সভর্তি কার্তুজ, হাতবোমা, মর্টার বোমা থাকে থাকে সাজান। ব্যারাকের একেবারে পশ্চিম কোণায় শত্রুর সোজাসুজি হলেও ভাগ্যক্রমে এগুলো ছিল অক্ষত।

পেতিয়া সানন্দে ছুটে গেল বন্ধুর কাছে। কয়েক মিনিট বাদেই আবিষ্কারের খবরটা দিল দলপতিকে। সঙ্গে সঙ্গে

একদল লোক পাঠান হল ছেলেদুটির সঙ্গে। গেটের উপরকার জার্মান সাবমেশিনগান থেকে ক্রমাগত গুলি ছুটছে, ওরা বাক্স নিয়ে খোলা জায়গার উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি করে ছোটাছুটি করতে লাগল। এই বালকদুটি সেদিনকার আসল বীর। ওদের কল্যাণেই ৩৩৩ নং রেজিমেণ্ট অনেক বেশী দিন পর্যন্ত সামলাতে পারল নিজ এলাকাকে।

এই ছেলেদুটিই আবার পশ্চিম ব্যারাকের জানলা দিয়ে দেখতে পায় জার্মানদের তৈরী লম্বা পণ্টুন পুলটাকে। রাতের বেলা বুগের উপর এটাকে বানায় শত্রুর দল। এরই উপর দিয়ে দলে দলে শত্রুর পদাতিক সৈন্য আর গোলাবারুদ বোঝাই লরি আসতে থাকে।

মর্টার পল্টনের হাতে এখন প্রচুর গোলা। পুলের উপর আক্রমণ চালাল তারা। তাদের প্রথম গোলা কাঠের তক্তা গুঁড়ো করে ফেলল, বন্ধ হয়ে গেল সৈন্য আর লরির চলাচল। একটা লরি বিস্ফোরণে জখম হয়ে জলে তলিয়ে গেল, আর একটা থেমে গেল পুলের মাঝপথে এসে, রাস্তা গেল আটকে। পদাতিকরা আতঙ্কে তীরের দিকে পিছিয়ে গেল, কিন্তু মর্টার বোমা ওদের পিছু ধাওয়া করল, পুলের মুখে ছুটে-যাওয়া সৈন্যের জটলার মাঝখানে লাফিয়ে উঠল বিস্ফোরণের কালো ধোঁয়ার স্তম্ভ। জার্মান গোলন্দাজরা পাল্টা গোলা চালিয়ে মর্টার আক্রমণ থামাতে চাইল, কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যরা দিব্যি লুকিয়ে আছে ব্যারাকের মধ্যে। পুলের উপর অবিরাম গোলাবর্ষণে শত্রু আর পার হতে পারল না।

কেল্লার উত্তরাঞ্চলে লড়াইটা আগের দিনের চাইতে মরিয়া হয়ে উঠে। গাভ্রিলভের কোম্পানিগুলো বাঁধের ভিতর ঘাঁটি গেড়ে একটার পর একটা আক্রমণ রুখতে লাগল। শত্রুর তরফ থেকে সাবমেশিনগানচালকদের দুর্গপরিখা পার হয়ে বাঁধ টপকাবার সব চেষ্টাই হল ব্যর্থ। প্রতিবার চেষ্টার ফল দাঁড়াল এই যে শত্রুর বহু সৈন্য মারা পড়ল খালপারে, যারা বেঁচে রইল হুড়োহুড়ি করে ঢুকল ঝোপের ভিতর। ওখানে ওরা ইতিমধ্যেই বড় রকমের নানা পরিখা কেটেছে।

কখনো বা ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে ট্যাঙ্ক। দুর্গরক্ষীরা ওদের প্রাচীরের কাছে আসা পর্যন্ত চুপ করে রইল, তারপরেই শুরু করল হাতবোমার বৃষ্টি। একটা ট্যাঙ্ক ঘায়েল হল এবং জার্মানরা সেটাকে দড়ি দিয়ে টেনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও একদল ট্যাঙ্ক ঢুকে পড়ল উত্তরের গেট দিয়ে। গাভ্রিলভের পদাতিকদের গুলি খেয়ে ট্যাঙ্ক বহরের সঙ্গে আসা শত্রু পদাতিক সৈন্যরা পিছু হটলেও গোটা দুই তিন ট্যাঙ্ক ত্রিখিলান গেটের ভিতর দিয়ে অফিসার কোয়ার্টারের পাশ কাটিয়ে কেল্লার কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ল। এদের একটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সরাসরি ব্যারাকের উপর গোলা ছুড়তে লাগল।

ঠিক এমনি সময়ে ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাকের মাটির নীচের তলা থেকে বেরিয়ে এল দুটি লোক। সিনিয়র লেঃ

সেমেনেন্‌কো এবং আর একজন অজ্ঞাত গোলন্দাজ সার্জেণ্ট-মেজর। এরা ঠিক করল জার্মান ট্যাঙ্কের সঙ্গে লড়াই চালাবে।



সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সান্দ্র্‌ সেমেনেন্‌কো, ১৯৪১

যুদ্ধ শুরু হবার আগে মাটির তলার ঘরের ঠিক সামনে চত্বরের উপর দাঁড় করান ছিল ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের কামানগুলি। এগুলির বেশীর ভাগ তখন নষ্ট হয়ে গেছে জার্মান গোলার ঘায়ে। কিন্তু একটা তখনও ছিল ঠিক। ওরা স্থির করল এটাকে জার্মান ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে বিশেষ করে যখন কাছাকাছি পড়ে আছে গোলায় ভরা বাক্সগুলো।

জার্মান মর্টার গোলা ফাটছে প্রাঙ্গণে। কিন্তু সে সব উপেক্ষা করে সেমেনেন্‌কো এবং সার্জেণ্ট-মেজর কামানটাকে ত্বরিৎ গতিতে ট্যাঙ্কের দিকে তাক করবার চেষ্টা করল। কামানের নিরীখ করার যন্ত্র নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু সার্জেণ্ট-মেজর নল দিয়ে তাক করল। সেমেনেন্‌কো প্রথম গোলাটা ভরল। কামান দাগতে ট্যাঙ্কের ট্রাকের কাছে বিস্ফোরণের কালো ধোঁয়া বার হল।

স্পষ্টই জার্মানরা কামানটাকে লক্ষ্য করেছিল, কারণ ট্যাঙ্কের বুরুজটা সেদিকে ঘুরতে শুরু করল। ইতিমধ্যেই অবশ্য দ্বিতীয় গোলা ভরা হয়েছে। ট্যাঙ্কের গোলন্দাজ তাক করতে পারার আগেই গোলাটা বুরুজের উপর পড়ে সেটাকে আটকে দিল। আর দুটো গোলা ছুটল পর পর, ঘায়েল হল ট্যাংকটা। পরমুহূর্তে মর্টার গোলা পড়তে লাগল কামানটার চারদিকে। ওরা দুজনেই আশ্রয় নেবার জন্য ছুটল। তাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হল। জার্মানরা ট্যাংকটাকে অন্য ট্যাঙ্কের সঙ্গে বেঁধে কেল্লার ফটক দিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চলে দ্বিতীয় ট্যাঙ্ক বহর হাজির হল প্রধান প্রবেশদ্বারে। এদের রুখে দাঁড়াল মেজর গাব্রিলভের বিমান-ধ্বংসী গোলন্দাজরা।

প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের ফলে গোলন্দাজদের কাছে মাত্র একটি কামানই ছিল কাজের মত। এদের কম্যান্ডার একজন লেফ্‌টেনাণ্ট, আহত হলেও কোনরকম একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে কামানের কাছে থাকল। প্রথম জার্মান ট্যাংক গেটের সুড়ঙ্গে ঢুকতেই সে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল কামান দাগার নির্দেশ দিতে।

প্রথম গোলা ছুটতেই বিমান-ধ্বংসী কামানচালকরা জার্মানদের নজরে পড়ল। ট্যাংকটা গেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে ত্বরিৎ গতিতে গোলা ছুঁড়তে লাগল। কিন্তু জার্মানরা কামানের পাল্লা করতে পারার আগেই সোভিয়েত কামানের একটা তাকসই গোলা ট্যাংকটাকে ধ্বংস করে ফেলল, ধোঁয়া বার হতে লাগল

যন্ত্রটা থেকে। ওটা সরু ফটকটাকে এমন যুৎসই রকম আটকে দিল যে আর ট্যাঙ্কগুলো এগুতে পারল না।

তরুণ লেফ্‌টেনাণ্ট আঘাত সত্ত্বেও নিজেই কামান দাগছিল, নিজের প্রাণ দিয়ে এর মূল্য দিল সে। রক্ত মোক্ষণের ফলে হীনবল হয়ে কামানের উপর এলিয়ে পড়ল। ওর লোকরা কাছে এসে দেখল সে মারা গেছে।

মেজর গাভ্রিলভকে ওর মৃত্যু সংবাদ দিতে সে তার হেডকোয়ার্টারের কর্তাকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠাল। মেজর নিজেই এই লড়াই দেখছিল স্বচক্ষে।

'এই সুপারিশ করে একখানা চিঠি লিখুন যেন লেফ্‌টেনাণ্টকে মৃত্যুর পরও "সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর" উপাধী দেওয়া হয়। আমাদের মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই চিঠি সৈন্যবাহিনীর হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেব।'

কিন্তু অন্যান্য দলিলের মত এই চিঠিও কেল্লার লড়াইয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, এমনকি আজ পর্যন্ত ঐ বীরের নামটিও জানা যায়নি।

সন্ধ্যা নাগাদ সবকিছু ঠাণ্ডা মনে হল। শত্রুর গোলাবর্ষণের তোড়ও স্পষ্টই কম। এমনি সময় উত্তরাঞ্চলের বৃত্তাকার ব্যারাকের জানলায় পাহারারত সৈনিকরা মুখাভেৎসের অপর তীরে দেখতে পেল সোভিয়েত অফিসারের পোষাক-পরা একজন লোককে। লোকটি বাঁধের ওপর বার হল, তারপর বাঁধের নীচ থেকে নদী পর্যন্ত দৌড়ে গিয়ে পোষাক বুট না

খুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে নদী পার হল। বোঝা গেল শত্রু ওকে দেখতে পায়নি, কারণ একটা গুলিও ছুটল না ওর দিকে।

এটাও একটা ফাঁদ মনে করে জানলায় মোতায়েন রাইফেলধারীরা ওকে তাক করে রইল। অফিসারটিও আশঙ্কা করল ওকে হয়ত শত্রুর গুপ্তচর বলে ধারণা করা হবে, তাই পারে পেঁছেই সে চিৎকার দিয়ে উঠল:

'গুলি করো না! আমি সোভিয়েত!'

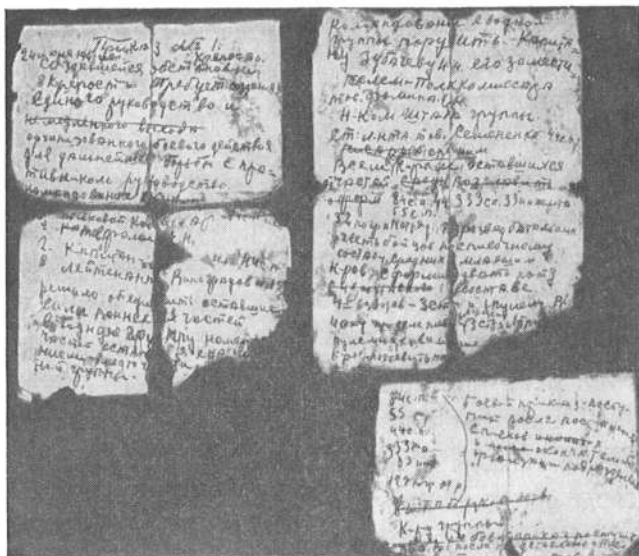
পর মুহূর্তেই সে পার ধরে দৌড় লাগাল। প্রাচীরের উপর মোতায়েন জার্মান মেশিনগানচালক গুলি ছুড়বার আগেই সে এক তলার জানলা গলিয়ে হুড়মুড় করে নির্বিঘ্নে ব্যারাকের ভিতর উপস্থিত হল। রাইফেলধারীরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ধরল।

যারা ৪৪ নং রেজিমেণ্টে কাজ করেছিল তারা এই অফিসারটিকে চিনতে পারল। সে নন-কমিশণ্ড অফিসার ইস্কুলের পরিচালক সিনিয়র লেঃ ভাসিলি বিৎকো। আপাদমস্তক ভেজা কিন্তু পরনে অফিসারের পুরো ইউনিফর্ম, এমনকি তরোয়ালের বেল্ট ও ফিনল্যাণ্ড লড়াইয়ে পাওয়া তার 'অর্ডার অফ দি রেড স্টার'ও আছে। সে পিস্তল হাতে নিজের লোকদের সামনে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ আগে গুলি ছোড়ায় পিস্তলটা তখনও গরম। বিৎকো শত্রু বেষ্টনী ভেদ করে লড়াই করতে করতে এসেছে অবরুদ্ধ গ্যারিসনের ভিতর নিজের দলটিকে পরিচালনা করতে।

বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে বিৎকো একা লড়াই করতে করতে এগিয়ে এসেছে, তার এই কৃতিত্বের সংবাদটি অবরুদ্ধ গ্যারিসনের কাছে সানন্দ প্রশংসায় অভ্যর্থিত হল। তার উপস্থিতির কথা এক পল্টন থেকে আর এক পল্টনে পেঁছতে সারা অঞ্চল জুড়ে জয়ধ্বনি উঠল। বিৎকো চটপট অবস্থাটা সমঝে নিয়ে নিজ অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করল। নূতন করে লোকদের মোতায়েন করে নির্দেশ দিল নন-কমিশন্ড অফিসারদের। এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ উৎসাহী অফিসারটিকে দেখে সবাই নূতন শক্তি পেল, নিকট ভবিষ্যতে সাহায্য পাবার আশা জাগল ওদের মনে, সংগ্রামের ইচ্ছা হল বলবতী।

...তৃতীয় দিন সকালে জার্মানিরা দুর্গের উত্তরাঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় ব্যারাকের উপর জোর আক্রমণ চালাল। ত্রিখিলান গেটের এবং পুলের চারদিকে শুরু হল প্রচন্ড লড়াই। আক্রমণ হটিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারী মাতেভোসিয়ান গুরুতর আহত হল। তাকে নিয়ে যেতে হল শ্বেত প্রাসাদের সেলারে। জার্মানিরা পিছিয়ে গেল, নূতন করে আক্রমণ চালাল না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই 'জাঙ্কার্সগুলো' কেন্দ্রীয় দ্বীপের উপর গর্জাতে লাগল, ব্যারাকের উপর বোমা ফেলতে লাগল প্রণালীবদ্ধভাবে ও দীর্ঘ সময় ধরে।

বোমাবর্ষণ দুর্গরক্ষীদের কাছে বিরাম বিশেষ। বিমান দেখা দিলেই জার্মানি পদাতিকের আক্রমণ বন্ধ, প্রায় পুরো সৈন্যদলই সেলারের ভিতর নিরাপদ আশ্রয়ে ঢুকতে পারে।



১ নং আদেশনামা

বিমান হামলার সময় একমাত্র মেশিনগানচালকরা থাকে নিজ নিজ জায়গায় যাতে প্রতিরোধের শৈথিল্যে শত্রু না কোন সুবিধে পায়।

২৪শে জুন বিমান আক্রমণ চলে অনেক সময় পর্যন্ত। সেই দীর্ঘ 'বিশ্রামের' সময় দুর্গের কেন্দ্রে প্রতিরোধ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত অফিসাররা একটা পরামর্শ সভা ডাকবার সুযোগ

পেল। অবস্থা আলোচনা করে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছে ওরা একটা আদেশনামা বানাল। লেঃ ভিনোগ্রাদভ সঙ্গে সঙ্গে ওটা কপি করল।

যুদ্ধের পর এই দুর্গ তল্লাশীর সময় ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে এই আধ-পচা কাগজগুলো আবিষ্কৃত হয়। সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে যারা দুর্গের ভার নিয়েছিল সেই লোকগুলির পরিচয়ের এই প্রথম সূত্র।

২৪শে জুন ১৯৪১এর '১ নং আদেশনামায়' বলা হয় অবস্থা বিধায় দুর্গের ভবিষ্যৎ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন সংযুক্ত পরিচালনা। সভায় যোগদানকারী অফিসারদের সিদ্ধান্ত এই যে সমস্ত ইউনিট একটি দলভুক্ত করা হবে।

৪৪ নং রেজিমেন্টের ভারপ্রাপ্ত দ্বিতীয় অফিসার অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন ইভান জুবাচিওভ একজন ঝানু কমিউনিস্ট। সে গৃহযুদ্ধে ও শ্বেতফিনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। এই যুক্ত দলের ভার দেওয়া হল ওকে। এর রাজনৈতিক সহকারী হল কমিশার ফোমিন এবং দলের হেডকোয়ার্টারের কর্তা সিনিয়র লেঃ সেমেনেন্‌কো। আদেশনামায় আরও বলা হল নিম্নপদস্থ অফিসাররা তাদের সৈনিকদের নামের তালিকা প্রস্তুত করবে এবং তাদের নিয়ে পল্টন বানাবে।

আদেশনামা কখনই পুরো লেখা হল না। বিমান হানা শেষ হতে শত্রুর সাবমেশিনগানচালকরা আবার হামলা শুরু করল, অফিসাররা ছুটে গেল নিজ নিজ পল্টনের কাছে। লড়াই এমন সাংঘাতিক হয়ে উঠল যে বিভিন্ন দলের সৈনিকদের নামের

তালিকা বানান হল অসম্ভব। তা ছাড়া অবস্থার পরিবর্তন ও শত্রুর ক্রমবর্ধমান আক্রমণে দলের গঠন ও অবস্থা ক্রমাগত বদলে যেতে লাগল।

'১ নং আদেশনামা' কখনও সুসম্পূর্ণ হয়নি এবং সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব না হলেও এর দ্বারা দুর্গরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়। দুর্গের কেন্দ্রে যুক্ত পরিচালনা গঠিত হওয়ায় সোভিয়েত প্রতিরোধ ব্যবস্থা হল শক্তিশালী ও অধিকতর কার্যকরী।

শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবে!

পূব দিক থেকে আসা দূরবর্তী কামান গর্জন অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। আসল সীমান্ত থেকে বর্তমান ফ্রণ্ট এখন অনেক পিছনে সরে এসেছে। যুদ্ধ সীমারেখার অনেক পিছনে যে গভীর স্তব্ধতা, লড়াইয়ের ক্ষণবিরতির সময় তা নেবে আসে রাত্রিতে দুর্গের উপর। মাঝে মধ্যে এই স্তব্ধতা ভেঙে যায় অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে-যাওয়া দূর পাল্লার বোমারু বিমানের গোঁ গোঁ আওয়াজে। কিন্তু সে ধরনের স্তব্ধতা বিরল। রাতদিন সমানে গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী আক্রমণ চালাল, কারণ শত্রুর চেষ্টা দুর্গরক্ষীদের বিন্দুমাত্র বিরাম না দেওয়া। ওদের আশা একটানা যুদ্ধের ফলে শক্তিহীন হয়ে সত্বর ওরা আত্মসমর্পণ করবে।

সাহায্যের আশা নিয়ে লোকগুলি বেঁচে রইল, যুদ্ধ চালাতে লাগল, জোর করে আশ্বাস আর বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখল। মাঝে মাঝে দুর্গ জুড়ে খবর রটল সোভিয়েত বাহিনী পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে আর সোভিয়েত ট্যাঙ্ক ব্রেস্ত অঞ্চলে এগিয়ে আসছে। খবরটা লোকগুলিকে আবার চাঙ্গা করে তোলে, দ্বিগুণ তেজে নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করে, পাল্টা আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এই গুজব বরাবরই ভিত্তিহীন বলে জানা গেলেও বার বারই এরকম রটতে থাকে এবং বিনা বাক্যে তা বিশ্বাস করা হয়।

এক রাতে সোভিয়েত দূর পাল্লার বোমারু বিমান উড়ে গেল উপর দিয়ে, লোকগুলি সঙ্গে সঙ্গে এর ইঞ্জিনের আওয়াজ থেকে নিজেদের বলে চিনতে পারল। পশ্চিমে অনেক দূর থেকে যখন বিস্ফোরণের একটা চাপা আওয়াজ এল ওরা বুঝতে পারল সোভিয়েত বিমান বুগের পরপারে রেলজাংসনে শত্রুর ট্রেনের উপর বোমা ফেলছে। দুর্গে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল, উঠল উল্লাস ধ্বনি, কেউ হয়ত শত্রুর ঘাঁটির উপর গুলি ছুড়ল। জার্মানিরা ঘাবড়ে গেল, তাদের গোলন্দাজরা সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে গোলা চালাতে লাগল দুর্গের উপর।

আর একবার দুর্গের উপর দেখা দিল একটি সোভিয়েত জঙ্গী বিমান। কেউ বুঝতে পারল না সুদূর ফ্রন্ট থেকে কী করে ওটা সেখানে এল। হঠাৎ মেঘের মধ্যে থেকে বিমানটির আবির্ভাব। বিমানটি চক্কর দিল দুর্গের উপর, অভ্যর্থনা জানিয়ে ডানাগুলো নাড়ল। ডানার উপর পরিষ্কার দেখা গেল

সোভিয়েত তারকা। দুর্গের সব জায়গা থেকে এমন প্রচণ্ড সোল্লাসধ্বনি উঠল যে মনে হল ফেটে-পড়া গোলার কান-ফাটান আওয়াজ ও বিমানের ইঞ্জিনের শব্দের মধ্যেও বৈমানিক তা শুনতে পেল।

এরপর দেখা দিল সীমান্তের ওপার থেকে এক ঝাঁক 'মেসার্‌শ্‌মিট' বিমান। স্তব্ধ দুর্গের ভিতর থেকে শত শত চোখ দেখতে লাগল সোভিয়েত বিমান ছোট পাল্লায় গুলি ছুড়ে নিজেকে বাঁচাচ্ছে আর পূব দিকে চলে যাচ্ছে, উঁচু থেকে আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে মেঘের নিরাপদ আশ্রয়ে। শেষ পর্যন্ত সব বিমানগুলোই আকাশে মিলিয়ে গেল। দিনভর অবরুদ্ধ বাহিনী স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশী দৃঢ়তা নিয়ে লড়াই চালাল। এমনকি যারা আহত তাদেরও অনেকে রাইফেল হাতে হামাগুড়ি দিয়ে ঘাঁটির কাছে এল। কারও মনে সন্দেহ রইল না যে দুর্গরক্ষীদের ভরসা দেবার জন্য হেডকোয়ার্টার থেকে এই একক বিমানটিকে পাঠান হয়েছে, তাদের জানাচ্ছে সাহায্য আসতে আর দেরী নেই। আসল কারণ যাই হোক না কেন, অজানা সোভিয়েত বৈমানিকটি দুর্গরক্ষীদের মনে নূতন শক্তির জোগান দিল, বিশ্বাস আনল চূড়ান্ত জয়ের।

কিন্তু দিন কাটতে লাগল, সাহায্য এল না। সবাই বুঝল তখনও পর্যন্ত ফ্রণ্টের অবস্থা সোভিয়েত বাহিনীর অনুকূলে আসেনি। লোকগুলি তাদের বিশ্বাসকে জোর করে আঁকড়ে থাকলেও মনে মনে টের পেল জয়ের সম্ভাবনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। কিন্তু যদি কেউ সন্দেহ প্রকাশের চেণ্টা করত সঙ্গে

সঙ্গে কমরেডরা তার মুখ বন্ধ করে দিত। বাহিনীর মধ্যে এই অলিখিত নিয়ম চালু ছিল কেউ সংগ্রামের অসুবিধে নিয়ে কথা কইবে না, জয় সম্পর্কে এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ চলবে না।

যাই হোক না কেন শেষ অবধি যুদ্ধ চালাব আমরা! এই সিদ্ধান্ত কোন লিখিত নিয়ম নয় বা কারও আদেশবাণীও নয়, তবু প্রতিটি দুর্গরক্ষীর হৃদয়ে গোপনে এই কথাটি বাসা বেঁধেছিল। বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই ক্ষুদ্র গ্যারিসন সেনাপতিমণ্ডলীর কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেলেও জানত তাদের কাজ কি। যত বেশী সময় ধরে তারা সংগ্রাম চালাবে ততই দেরী হবে অবরোধকারী শত্রু সৈন্যের ফ্রণ্টে পেঁছিতে। সুতরাং যুদ্ধ চালাতে হবে আরও নির্মমভাবে, কাটাতে হবে আরও বেশী সময়, শত্রুকে রুখতে হবে এইখানেই ফ্রণ্টের অনেক পিছনে, যতদূর সম্ভব গুরুতর ক্ষতি করতে হবে শত্রুর। এই ভাবে শত্রুর এগিয়ে যাবার শক্তিকে কমিয়ে যেতে হবে। আরও বেশী সাহস ও ধৈর্য নিয়ে তারা লড়াই করবেই, নিজেদের জীবন বিকিয়ে দেবে যথাসম্ভব চড়া দরে।

সত্যিই ওরা অসাধারণভাবে মরিয়া হয়ে লড়াই চালাল, অভূতপূর্ব দৃঢ়তা দেখিয়ে মৃত্যুকে করল উপেক্ষা।

বহুবার আহত হওয়া লোকও সংগ্রাম চালাতে লাগল। রক্ত-ক্ষয়ী অবস্থায় রক্ত-মাখা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শেষ শক্তি সংগ্রহ করে সৈন্যরা সঙ্গীন আক্রমণে অংশ নিল। যাদের অবস্থা খুবই খারাপ তারাও ঘাঁটি ছাড়তে রাজী হল না। কারুর ক্ষত যদি এমন সাংঘাতিক হত যে তার আর লড়াই করার শক্তি নেই সে

নিজেকে নিজে শেষ করে ফেলত যাতে তার দেখাশুনো করতে গিয়ে কমরেডদের কাজে অসুবিধে না হয় বা তারা জীবন্ত অবস্থায় শত্রুর হাতে ধরা না পড়ে। সে সময় প্রায়ই এই চিৎকার শোনা যেত: 'বিদায় কমরেড! আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিও!' এর পরেই গুলির শব্দ ...

দুর্গের উত্তরাঞ্চলে অফিসার কোয়ার্টারের সামনে যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানরা লাল ফৌজের একদল লোককে পাকড়াও করে। এর অধিনায়ক ১২৫ নং রেজিমেণ্টের আহত ক্যাপ্টেন ভ্ল্যাদিমির শাব্‌লভ্‌স্কি। ঐ সঙ্গে একদল নারী ও শিশুকেও বন্দী করা হয়। দলে ছিল শাব্‌লভ্‌স্কির স্ত্রী ও তার চারটি শিশু কন্যা। বড়টির বয়স আট বছর আর একেবারে ছোটটি মাত্র আট মাসের।

বন্দীদের পিছন দিকে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সাবমেশিনগানচালকদের কড়া পাহারায়। আহত ও অবসন্ন বন্দীদের হাঁটবার ক্ষমতা নেই বললেই চলে। একজন চলেছে আর একজনের উপর ভর দিয়ে। শাব্‌লভ্‌স্কির একটি হাত পট্টিতে ঝোলান, আর এক হাতে বাচ্চা মেয়েটি। যাবার পথে দলটিকে একটা পুল পেরুতে হয়। পুলের মাঝখানে পৌঁছে ক্যাপ্টেন তার মেয়েকে চুমো খেয়ে স্ত্রীর হাতে দিয়ে কমরেডদের উদ্দেশে চিৎকার করে ওঠে, 'আমার সঙ্গে এসো!' বলেই সে পুলের রেলিং টপকে ঝাঁপ মারে জলে। দলের অনেকেই তার পিছনে ঝাঁপ দেয়। জার্মান সাবমেশিনগানচালকরা গুলি ছোড়ে পাগলের মত। যারা ঝাঁপ

দিয়েছিল প্রত্যেকেই মারা পড়ল জলে। কিন্তু মুক্তি নয় মৃত্যুই চেয়েছিল ওরা, কারণ আহত ও অবসন্ন অবস্থায় ওদের সাঁতরে পালাবার ক্ষমতা ছিল না।

ক্যাপ্টেন শাব্‌লভ্‌স্কি ও তার লোকগুলির মৃত্যু শত্রুর মনেও জোর দাগ কাটে। জার্মানিরা সঙ্গে সঙ্গে দলটিকে ঘুরিয়ে ব্রেস্তের সহর জেলে নিয়ে যায়। দু'একদিন বাদে যখন দুর্গে বন্দী করা একদল নারী ও শিশুকে পুলের উপর দিয়ে নেওয়া হয় ওদের পাহারাদার বয়স্ক জার্মান সৈন্যটি রুশ ক্যাপ্টেন ও তার দলের লোকদের মৃত্যুর কথা তাদের বলে। সোভিয়েত সৈন্যের বীরত্বে তার কণ্ঠে শত্রুর প্রতি সশ্রদ্ধ বিস্ময়।



ক্যাপ্টেন ভ্লাদিমির শাব্‌লভ্‌স্কি

হিটলারের যে সব জেনারেল ও অফিসারদের কেল্লার উপর আক্রমণের ভার, দুর্গরক্ষীদের অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তায় তারা চটে যায়। তাদের সৈন্যদল তখনও সোভিয়েত রাষ্ট্রের সেই প্রথম কয়েক গজ মাটি আঁকড়ে আছে, অথচ অগ্রবর্তী দল এর মধ্যেই দখল করেছে মিন্‌স্ক, তারা এগিয়ে চলছে স্মলেন্‌স্ক আর মস্কোর

দিকে। একদিকে যখন ফ্রন্ট লাইনে এগিয়ে যাওয়া সৈন্য বিজয় মাল্যের জন্য পাল্লা দিচ্ছে, লাভ করছে অর্ডার আর পদক, সহরে আর গ্রামে হাত করছে দামী দামী জিনিষ, এখানে এই ব্রেস্ত কেল্লার প্রাচীরে জার্মান অফিসাররা সোভিয়েত স্নাইপারদের নির্ভুল গুলি চালনায় শুধু যে আতঙ্কগ্রস্ত তাই নয় স্পষ্টই তারা বড় কর্তাদের বিষ নজরে পড়ছে। হিটলারের হেডকোয়ার্টার থেকে জবাবদিহি আসছে কেন তখনও পর্যন্ত কেল্লা ফতে হয়নি। দিনকে দিন এই জবাব চাওয়ার ভাষা তিরিক্ষি ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে। এদিকে দুর্গরক্ষীরা চালিয়ে যাচ্ছে লড়াই, অবরোধকারীরা অবশ্য প্রতিরোধ ভাঙতে চেষ্টার কোনই কসুর করছে না।

বুগের পারে জড় হচ্ছে আরও কামানশ্রেণী। রাতদিন গোলা চালাচ্ছে গোলন্দাজ বাহিনী, মুহূর্তের জন্য ছাড়ান নেই। মর্টার গোলা দুর্গ প্রাঙ্গণের মাটি চষে ফেলছে, ব্যারাকের ইঁটের দেওয়ালে গোলার ক্ষত আর লোহার ছাদ টুকরো টুকরো। শত্রুর ভারি কামান দুর্গের ভবনগুলোকে ধ্বংসস্তূপ বানিয়ে ছাড়তে লাগল। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানরা আগুনে-বোমা ছুড়ছিল, আর পরে জ্বলন্ত পেট্রোল ছোড়ার যন্ত্র তারা ব্যবহার করতে শুরু করল। বিমান পেট্রোলে ভরা পিপে আর ট্যাংক দুর্গে ফেলতে লাগল, সঙ্গে বোমা ত আছেই। কখনও কখনও দুর্গের অংশবিশেষ পরিণত হল অগ্নিকুণ্ডে।

যে ভবন দুর্গরক্ষীদের আশ্রয় তারা পরিণত হচ্ছে ধূমায়িত ধ্বংসস্তূপে। সেখানে কোন জীবন্ত প্রাণীর থাকা সম্ভব নয়, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে মেশিনগান আর রাইফেলের গুলি শুরু হল। রক্ষীদের মধ্যে যারা বেঁচে ছিল আহত হওয়া ও সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যাওয়া সত্ত্বেও তারা লড়াই আবার চালাতে লাগল।

রাতে ব্যারাক প্রাচীরের কাছে শত্রু পাঠাল একদল অন্তর্ঘাতককে। বিস্ফোরক ভর্তি বাক্স টেনে এনে ওরা চেষ্টা করল প্রতিরোধকারীদের বাড়িগুলোতে মাইন পাততে। স্যাপার দল হামাগুড়ি দিয়ে চলল দুর্গের ছাদ বেয়ে, ডিনামাইট ভর্তি বাক্স ফেলে দিল চিমনির ভিতর দিয়ে। চিলেঘরের অন্ধকারে হঠাৎ শুরু হল হাতাহাতি লড়াই। অপ্রত্যাশিত বিস্ফোরণের শব্দ কানে এল, ছাদ আর দেয়াল গেল ধ্বসে, চাপা পড়ল দুর্গরক্ষীরা। স্তম্ভিত বা আহত হলে, এবং ধ্বংসস্তূপে প্রায় চাপা পড়লেও ওরা অস্ত্র ছাড়ল না। স্যাপারদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জার্মান সরকারী দলিলে এই বর্ণনা পাওয়া যায়: 'কেন্দ্রীয় দ্বীপে অফিসার কোয়ার্টার থেকে পাশের গুলি চালানো বন্ধ করার জন্য ৮১ নং স্যাপার ব্যাটালিয়নের অন্তর্ঘাতক দলকে পাঠান হয় বাড়ির ভিতরকার সৈন্যদলকে সাবাড় করার জন্য। ছাদ থেকে বিস্ফোরক নাবিয়ে দেওয়া হয় জানলা অবধি আর তাতে ফিউজ দিয়ে আগুন লাগান হয়। বিস্ফোরণে আহত রুশিদের চিৎকার আর গোঙানি শোনা যায় কিন্তু গুলি তারা চালাতেই থাকে।'

যথাসম্ভব কম সময়ে প্রতিরোধকারীদের খতম করার জন্য শত্রু জঘন্যতম উপায় নিতেও ইতস্তত করল না। হাসপাতাল দখল করে আহত লোকদের ওরা খুন করল। তারপর একদল সাবমেশিনগানচালক হাসপাতালের গাউন পরে খোল্‌ম্‌ গেটের পুলের উপর দিয়ে কেন্দ্রীয় দ্বীপে দৌড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু ফোমিনের লোকরা যথাসময়ে ওদের এই চালাকি ধরে ফেলে। ওদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর একবার এই অঞ্চলে হামলাদার একদল শত্রুসৈন্য হাসপাতালে আটক করা নার্সদের সামনে রেখে এগুতে থাকে। কিন্তু উ'চু তলায় মোতায়েন সোভিয়েত মেশিনগানচালকরা যখন এই আক্রমণও প্রতিহত করে, ফ্যাশিস্টরা তখন নার্সদের পিছনে আশ্রয় নিতে না পারায় তাদের হত্যা করে। পূব গড়ে আক্রমণের সময় ফ্যাশিস্টরা তাদের সামনে সোভিয়েত বন্দীদের রেখে চলতে থাকে। দুর্গরক্ষীরা শুনতে পায় বন্দীরা চিৎকার দিচ্ছে: 'গুলি চালাও কমরেডরা, গুলি চালাও! আমাদের ছেড়ে দিও না!'

গোড়া থেকেই শত্রু চেষ্টা করে সোভিয়েত সৈন্য ও অফিসারের পোষাকে দুর্গে গুপ্তচর পাঠাতে। কখনো বা এরা উত্তেজনা সৃষ্টিকারীর কাজ করে, জার্মান বন্দীশালা থেকে পালিয়ে এসেছে বলে ভান করে এবং রক্ষীদের ভেতর আতঙ্ক ছড়াবার জন্য যত রাজ্যের গুজব চালায়। কখনো বা এরা হয় অন্তর্ঘাতক, অপেক্ষা করে বিশ্বাসঘাতকের মত পিছন দিক থেকে সোভিয়েত সৈনিকদের উপর গুলি চালাবার সুযোগের। কিন্তু

এই শয়তানদের স্বরূপ বুঝতে সোভিয়েত সৈন্যের দেরী হয়নি। ওদের ধরে ফেলে গুলি করা হয়।

প্রতিদিন বিমান হানার পর ছোটো বিমান দুর্গের উপর দেখা দিয়ে প্রচারপত্র ছড়ায়। যুদ্ধের আগে বার্লিনে ছাপা এই সব প্রচারপত্রে বলা হয় জার্মান সৈন্যরা মস্কো দখল করেছে, লাল ফৌজ বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করেছে আর প্রতিরোধ বৃথা। পরে দুর্গ গ্যারিসনের কাছে সরাসরি আবেদন জানিয়ে প্রচারপত্র ফেলা হয়। নাজি নেতারা দুর্গরক্ষীদের বীরত্ব ও মানসিক বলের তারিফ জানায়, প্রমাণ করার চেষ্টা করে আর লড়াই করা অর্থহীন, বাহিনীকে 'সম্মানজনক আত্মসমর্পণের' সর্ত জানায়। কিন্তু কেল্লার একমাত্র জবাব গুলি। এক দিন ৮৪ নং রেজিমেণ্টের ঘাঁটি থেকে একদল রাইফেলধারী প্রচারপত্র বিলি করা একটা শত্রু বিমানকে গুলি করে মাটিতে ফেলে। আর একবার ফোমিনের পদাতিকরা দু'তিন ডজন এই প্রচারপত্র জোগাড় করে এবং ভলগা-জার্মান সার্জেণ্ট-মেজর মেইয়ার প্রত্যেকটির উপর শূকরের ছবি আঁকে। শূকরের উপর হিটলারের গোঁফ, তার নীচে লেখা: 'সোভিয়েত বাগানে ফ্যাশিস্ট শূকর ঢুকতে পাবে না!' একদল কমসমল সভ্য শত্রুর খোঁজে বেরিয়ে সত্বর একজন জার্মানকে বন্দী করে আনে। লোকটার আপাদমস্তক এই সব প্রচারপত্র এঁটে সে অবস্থায় তাকে ফেরৎ পাঠান হয় নিজের ঘাঁটিতে।

যুদ্ধের মাঝখানে ক্ষণকালীন বিরতির সময় জার্মান লাউডস্পীকার শোনা যায় দুর্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। এতেও

দুর্গ গ্যারিসনের প্রতি সেই আবেদন, তাদের অস্ত্র সংবরণ করতে বলা হয়। যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রতি 'ভাল ব্যবহার, খাদ্য ও সেই সঙ্গে আহতদের শুশ্রূষার' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু দিনের পর দিন এই প্রচারের ভাষাও কঠিনতর হয়ে ওঠে। অনুগ্রহ ভরা আবেদনের পরিবর্তে ভয়ংকর শেষ প্রস্তাব জানানো হয়, বলা হয় ওদের বিবেচনার জন্য আধ বা এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হচ্ছে। তার পর শত্রু তাদের 'পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করবে, প্রতিরোধকারীদের ধূলিসাৎ করবে'। কিন্তু এই সব আবেদনের জবাবও এল গুলিতে। একবার রক্ত দিয়ে এই কয়টি কথা লিখে একখানা নিশান টাঙান হল উত্তর গেটে: 'মরব তাও স্বীকার, দুর্গ আমরা ছাড়ব না!'

সাধারণত জার্মানিদের অভ্যাস হল শেষ প্রস্তাবের পর গুলিগোলা বন্ধ করে দেওয়া। এ সময়টা চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে যেত। কেবলমাত্র ভেসে আসত থেকে থেকে ঘোষকের গলা: 'দশ মিনিট বাকি!' 'পাঁচ মিনিট বাকি!' সময় পার হতেই কামান আর মর্টার থেকে দুর্গের উপর শুরু হত ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাবর্ষণ, সঙ্গে চলত বোমারু বিমানের মারাত্মক হানা।

শত্রু ক্রমশ ভারি বোমা চালাতে লাগল। এর ঘায়ে সবচাইতে শক্তিশালী দুর্গ ভবনও ধ্বসে যায়। মাটির নীচে গভীর সেলারের কংক্রীটের মেঝে চিড় খেত আর বিস্ফোরণের ধাক্কায় লোকদের নাক কান দিয়ে রক্ত বার হত।

২৯শে জন জার্মানরা সবচেয়ে ভারি বোমা দেগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়।

সেদিন সকালে ব্রেস্তের নাগরিকেরা দেখতে পেল সহরের বহু উঁচু বাড়ির ছাদের উপর জার্মান অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছে, দূরবীণ দিয়ে দেখছে কেল্লাটিকে। ফ্যাশিস্টরা সহরের নাগরিকদের অহঙ্কার করে বলেছে সেদিনই কেল্লার উপর শ্বেত নিশান উড়বে। অসংখ্য বোমারু বিমান দুর্গের উপর গর্জাতে লাগল। পর মুহূর্তেই কান ফাটান বোমা বিস্ফোরণে সারা সহর উঠল কেঁপে — এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। ভূমিকম্পের মত সহরের দেয়ালও চিড় খেল। সমস্ত দুর্গাঞ্চল ছেয়ে গেল ধোঁয়ায় আর ধুলোয়। দূর থেকেও লোকরা দেখতে পেল বিস্ফোরণের ধাক্কায় বড় বড় গাছগুলো আমূল আকাশের অনেক উঁচুতে ছিটকে উঠছে। মনে হল বাস্তবিকই কোন মানুষের পক্ষে এই আক্রমণে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

কিন্তু বিমান আক্রমণ শেষ হতে ধোঁয়া আর ধুলো যখন মিলিয়ে গেল ছাদের উপর থেকে বৃথাই অফিসাররা দূরবীণের ভিতর দিয়ে চাইল। ধ্বংসস্তূপের কোনখানেই শাদা নিশানের চিহ্ন নেই। হয়ত এই কথা ধরে নেওয়া হত নিশান তোলবার মত কেউ বেঁচে নেই। কিন্তু কিছু সময় বাদেই আবার কানে এল মেশিনগান আর রাইফেলের শব্দ। বোমার ঝড় থেকে কোন অবিশ্বাস্য উপায়ে বেঁচে থাকা লোকগুলি আবার লড়াই চালাতে শুরু করেছে।

যুদ্ধ বেষ্টনী

ধ্বংসাত্মক বিমান হানা, অবিরাম কামান ও মেশিনগানের গুলি, বর্ধমান পদাতিক আক্রমণ, শত্রুর সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের প্রাধান্য — সবকিছু মিলে বীর গ্যারিসনের প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে অতিরিক্ত দুঃসাধ্য করে তুলল। এ সমস্ত দুর্দৈবেরই প্রকৃতি কিন্তু সামরিক। সৈন্যের অদৃষ্টে এটা অবধারিত, এমনকিছু যার জন্য সে আগে থেকেই প্রস্তুত। একমাত্র প্রভেদ এই যে এ ক্ষেত্রে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে অত্যধিক পরিমাণে।

কিন্তু অবরোধের প্রথম দিন থেকেই এই দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুক্ত হল অন্য ধরনের ক্লেশ। এরই ফলে দুর্গ গ্যারিসনের অবস্থা হল অভূতপূর্ব ভয়ঙ্কর। এ শুধু লড়াইয়ের ব্যাপার নয়, অবরুদ্ধ গ্যারিসনের সমস্ত জীবন নির্ভর করছে শারীরিক ও মানসিক শক্তির অতিমানবিক চাপের উপর। এই অস্বাভাবিক অবস্থার ফলেই ব্রেস্ত কেল্লার মহান প্রতিরোধ অসাধারণ বীরত্ব ও মর্মন্তুদ চরিত্রে রূপ নেয় আর এই কারণেই দেশরক্ষার মহান যুদ্ধের ইতিহাসে তা অনন্য হয়ে আছে।

ওদেসা ও সেভাস্তোপল রক্ষীদের সাহস, লেনিনগ্রাদবাসীর লৌহকঠিন দৃঢ়তা, স্তালিনগ্রাদের প্রখ্যাত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের বীরত্বময় কার্যকলাপ, ১৯৪৪—১৯৪৫ সালে জয়মণ্ডিত সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ — সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর এই সব গৌরবময় কৃতিত্ব অবশ্যই মানুষের মনে চির জাগরূক থাকবে সামরিক শৌর্যের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত

হিসেবে। কিন্তু এই সব যুদ্ধে সোভিয়েত বাহিনী সত্যিকারের যে চমকপ্রদ সংগ্রামী নৈপুণ্য দেখিয়েছে আর যার জন্য পৃথিবীর সেরা সৈন্য হিসেবে তারা নাম কিনেছে তা সম্ভব হত না যদি না তারা যুদ্ধের প্রথম মাস কয়টিতে অভিজ্ঞতার কঠোর শিক্ষা পেত। পশ্চাদ্দিকরক্ষক অসংখ্য লড়াই আর বড় ও ছোট ধরনের যুদ্ধে তাদের সাহস দৃঢ়তর এবং সামরিক নৈপুণ্যে অতিমাত্রায় সুসম্পূর্ণ হয়েছে। পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ থেকে এসেছে যুদ্ধ করার কঠিন বাসনা। পিছিয়ে আসার কষ্টকর ও ভয়ঙ্কর পথে শত্রুর উপর জন্মেছে আন্তরিক ঘৃণা। এ না হলে ভবিষ্যতে জয়লাভ হত অসম্ভব।

অবরোধের বেষ্টনীতে, গোলা ও বোমা বৃষ্টির মাঝখানে দুর্গটিকে বলা চলে একটা ক্ষুদ্র ওদেসা বা ছোট সেভাস্তোপল। লেনিনগ্রাদের বীর জনগণের মত দুর্গরক্ষীরা অসহ্য দুঃখকষ্ট সহ্য করেও লড়াই চালিয়ে যায়। দুর্গের ধ্বংসস্তূপের উপর মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে ওরা স্তালিনগ্রাদের বীরদের মত মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করে।

কিন্তু প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় ওদেসা ও সেভাস্তোপল, লেনিনগ্রাদ ও স্তালিনগ্রাদের লোকেরা জানতে পারে দেশের সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য নাড়ির যোগাযোগ। মহান মাতৃভূমির সবাই আছে ওদের সঙ্গে, সমগ্র জনগণের চোখ ওদের ওপর। এই অসম যুদ্ধে মহান কমিউনিস্ট পার্টি অবিরাম তাদের উৎসাহ দেয়, সর্বোচ্চ সেনাপতিমণ্ডলী দৃঢ় আশ্বাসের সঙ্গে তাদের কার্যকলাপ করছে পরিচালনা। সারা দেশ লক্ষ্য রাখে

অবরুদ্ধ সহরের গ্যারিসনের প্রয়োজন যেন মেটানো হয়। সংবাদপত্র ও বেতার তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের খবর সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দেয়, সকলের মুখে মুখে বীরদের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রেস্ত দুর্গরক্ষীদের এসব কিছুই ছিল না। সেই সংকটময় মুহূর্তে, যখন প্রতিটি সোভিয়েত লোকের মনে মাতৃভূমির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ, তখন গুলি আর মৃত্যুর মাঝখানে সংগ্রামরত সীমান্তের মুষ্টিমেয় লোকগুলির কাছে বাইরে থেকে মাত্র একই ধরনের খবর পৌঁছত। এ হচ্ছে জার্মানি প্রচারপত্র ও জার্মানি বেতারের মিথ্যে কাহিনী। ওরা বার বার ঘোষণা করে সোভিয়েত বাহিনী সাবাড় হয়ে গেছে, মস্কো কবলিত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। হেডকোয়ার্টার থেকে ওরা কোন নির্দেশ পায়নি, বিমান থেকে ওদের রসদ ফেলা হয়নি, কাগজে ওদের কথা লেখা হয়নি; এমনকি তখনও দেশের কেউ জানেও না যে ওরা লড়াই চালাচ্ছে। মাতৃভূমি, পূব দিকে পিছিয়ে-আসা তাদের কমরেড এবং প্রিয় পরিজনের স্মৃতির সঙ্গে একটা দুঃখদায়ক অনিশ্চয়তা জড়ানো। তাদের সামনে কি আছে চিন্তা করলে শত্রুর বন্দীশালায় মৃত্যু, লজ্জা ও অপমান ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে না। নিজ থেকেই তারা বুঝতে পারল তাদের এই বীরত্বজনক সংগ্রামের কথা কেউ সম্ভবত কখনো জানবে না, এমনকি দেশের লোকের কাছে তারা রইবে অজানা। তবু তারা লড়াই চালানো বন্ধ করেনি কারণ যে মাতৃভূমি, যার থেকে শত্রু

তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে, তার কথা ওদের প্রত্যেকের হৃদয়ে বাসা বেঁধে আছে। ওরা গৌরবের জন্য, এমনকি নিজ প্রাণের জন্যও লড়াই করেনি, করেছে দেশের প্রতি এটা তাদের কর্তব্য বলে। তাদের মনে ছিল এই গভীর বিশ্বাস, আজ বা কাল শত্রু ওদের মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হবেই হবে।

যুদ্ধ সীমানার পুরোভাগে যে ঝানু সৈনিক, যার অভিজ্ঞতা জন্মেছে কঠোরতম সংগ্রামের, তার পক্ষেও ধারণা করা মুশকিল কী অবিশ্বাস্য কঠিন অবস্থার মধ্যে ব্রেস্ত গ্যারিসনকে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম চালাতে হয়েছে।

গোলা আর বোমার ঘায়ে দুর্গ প্রাঙ্গণের জমি একেবারে তচনচ হয়ে গেছে। বাতাসে বুলেট আর গোলার টুকরোর তীক্ষ্ণ আওয়াজ। দিনরাত্রি গোলা আর বোমা বিস্ফোরণের বিরাম নেই। নিয়ম মাফিক শেষ প্রস্তাব জানাবার পর যে ক্ষণকালীন নিস্তব্ধতা নেবে আসে তা আরও ভীতিজনক। এর চাইতে অবিরাম বোমা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভাল। এতে ওরা অভ্যস্ত।

আগুনে-বোমা, গোলা, বিমান থেকে পেট্রোলে ভরা ট্যাংকগুলো ফেলার যা ফল তা চলতে লাগল। যা কিছু জ্বলবার সবই জ্বলতে লাগল দুর্গের মধ্যে। ২২শে জুন ভোরে যে আগুন জ্বলে তা এক মাস ধরে চলতে থাকে, এক জায়গায় নেভে ত জ্বলে ওঠে আরেক জায়গায় নূতন করে। শান্ত দিনগুলিতে ঘন ধোঁয়া অচল হয়ে ভাসতে থাকে কেল্লার উপর।

বহুদিন ধরে পশ্চিম ব্যারাকের সামনের চত্বরে যানবাহন ব্যাটালিয়নের গাড়ীগুলো পুড়তে থাকে। এখানে লড়াই চালাচ্ছিল ৪৪ নং রেজিমেণ্টের সৈনিকরা। জ্বলন্ত রবারের কড়া ধোঁয়ায় লোকদের দম আটকে এল। বৃত্তাকার ব্যারাকের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে ছিল একটা বিরাট পোষাক রাখার ভাঁড়ার। সেটায় আগুন লেগে এমন অসহ্য ধোঁয়া বার হতে লাগল যে তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রক্ষাকারীরা, ৪৫৫ নং রেজিমেণ্টের সৈনিকরা, শ্বাসজালি পরতে বাধ্য হল।

আগুন সেঁধুল সেলার পর্যন্তও। মাথার উপর অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাপ এমনই বেড়ে গেল যে সেলারের খিলান সিলিংএর কোন কোন অংশে গলে-যাওয়া ইঁটের বড় বড় ফোঁটা ঝুলে থাকত।

বোমা যে মুহূর্তে পড়তে শুরু করে বিস্ফোরণের ফলে ওঠা শুকনো গরম ধূলো এবং পুড়ে-যাওয়া বারুদের ঝাঁঝাল গন্ধে পুরু ধোঁয়া মন্থর হয়ে থাকে। ধোঁয়া আর ধূলোয় লোকগুলোর গলা আর মুখ শুকিয়ে যায়, সোজা ঢোকে ফুসফুসের ভিতর, ফলে কষ্টদায়ক কাশি আর অসহ্য তেষ্টা পায়।

গ্রীষ্মের দিনগুলো তপ্ত। প্রতিদিন পচন ধরা শবদেহের গন্ধ বীভৎস হয়ে ওঠে। রাতে রক্ষীরা আশ্রয় থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে, কিন্তু সংখ্যা এত বেশী যে সামান্য মাটির চাপা দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। পরের দিন রোদে শবদেহ আবার

পচতে শুরু করে। মাঝে মধ্যে বাতাস উঠলে শুধু সেই পূতি গন্ধ কিছুটা দূর হয়, লোকগুলি সতেজ বাতাসে শ্বাস নেয়।

এ ছাড়া আরও অনেক বেশী দুর্দশা ছিল।

যথেষ্ট খাদ্য ওদের ছিল না। যুদ্ধের প্রথম কয়েক ঘণ্টায় বেশীর ভাগ খাবার নষ্ট হয়ে বা পুড়ে গেছে। কিন্তু কিছু সময় না কাটতে অভাবটা টের পাওয়া গেল না। প্রথমে স্নায়ুর উপর লড়াইয়ের যে প্রচণ্ড চাপ তাতে ক্ষুধা লোপ পেল। মাত্র দ্বিতীয় দিনে লোকেরা খাদ্য খুঁজতে লাগল। বিধ্বস্ত গুদাম থেকে কিছু খাদ্য উদ্ধার করা হল। সামান্য খাবার পাওয়া গেল রেজিমেণ্টের খাবার ঘর থেকে। কিন্তু গ্যারিসনকে খাওয়াবার জন্য চাই অনেক বেশী খাদ্য। প্রতিদিন ক্ষুধার কষ্ট বেড়ে চলল। কখনো বা মৃত শত্রু সৈনিকের অনুসন্ধান করে তাদের ব্যাগের মধ্যে দুর্গরক্ষীরা পেল বিস্কুট, চিনি বা চকোলেট। কিন্তু যা কিছু পাওয়া গেল তার পুরোটাই দেওয়া হল আহতদের এবং সেলারের মধ্যে আশ্রয়-নেওয়া নারী ও



সৈন্য নিকলাই গাইভরন্স্কি

শিশুদের। ৪৪ নং রেজিমেণ্টের রান্নাঘরের পাশের ক্ষুদ্র ভাঁড়ার ঘরে পাওয়া গেল এক পিপে মাখন, সেটা চলল দু'দিন। তৃতীয় দিনে ৮৪ নং রেজিমেণ্টের লোকেরা মেসের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আবিষ্কার করল আধবস্তা আসিদ্ধ মটর। ফোমিনের নির্দেশমত মটরগুলিকে সযত্নে গুণে প্রত্যেককে ভাগ করে দেওয়া হল। তারপর গ্যারিসনের সৈনিকরা নিহত ঘোড়ার মাংস খেতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন যেতেই উত্তাপের জন্য এমনকি এ ধরনের খাদ্য থেকেও বঞ্চিত হল ওরা। লোকগুলি পরিণত হল জীবন্ত কঙ্কালে। হাত পাগুলো শুধু হাড় হয়ে দাঁড়াল, তার সঙ্গে চামড়া শক্ত করে আঁটা। তবু সেই হাতে ওরা অস্ত্র ধরে রাখল। ক্ষুধা ওদের যুদ্ধ প্রতিজ্ঞাকে ভাঙতে পারল না।

সব রকমের চিকিৎসা দ্রব্যের অভাব দেখা দিল। প্রথম দিনটিতে এত রক্তপাত আর আঘাতের ব্যাপার ঘটল যে ব্যাণ্ডেজ ও আনুষঙ্গিক জিনিষ সবই শেষ হয়ে গেল। মেয়েরা তাদের অন্তর্বাস ছিঁড়ে ব্যাণ্ডেজ বানাল, বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড় দিয়েও এই কাজ করা হল। তবু কাজ চালাবার মত সেগুলো যথেষ্ট নয়। লোকে যা কিছু পেল তাই দিয়েই ক্ষত বাঁধতে লাগল বা কোন কিছুই না বেঁধে লড়াই চালাল। জার্মান মর্টার গোলার একটা টুকরোয় সাধারণ সৈনিক নিকলাই গাইভরন্স্কির পেট ফাঁক হয়ে গেল। কমরেডরা তার এই সাঙ্ঘাতিক ক্ষত বেঁধে দিল একটা শার্ট দিয়ে। এই অবস্থায় সে তার ঘাঁটিতে থাকে তিন সপ্তাহ, এমনকি সঙ্গীন আক্রমণে

যোগও দেয়। ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাকের মাটির নীচের ঘরে ছিল আহত সীমান্তরক্ষী বব্রিওনক। সে প্রচণ্ডভাবে বোমার ধাক্কা খায়। বারবার অচৈতন্য হওয়া সত্ত্বেও তার রাইফেল ছাড়েনি। জ্ঞান ফেরামাত্র গুঁড়ি মেরে জানলায় গিয়ে আবার অচৈতন্য হওয়া পর্যন্ত হানাদারদের উপর গুলি চালায়।



সিনিয়র সহকারী সার্জন ভালেন্তিনা রায়েভস্কায়া, ১৯৪১

ব্যাণ্ডেজ বদলাবার মত কিছুই ছিল না। বহু লোক মারা গেল ঘা পচে ও রক্তদুষ্টির ফলে। তবু রক্ত মোক্ষণ ও দুঃসহ কষ্ট সত্ত্বেও কিছু কিছু লোক ঘাঁটি আগলে রইল।

গ্যারিসনের চিকিৎসকরা আহতদের যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য যথাসাধ্য করল বীরোচিত আন্তরিকতার সঙ্গে।

৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের সিনিয়র সহকারী সার্জন ভালেন্তিনা রায়েভ্‌স্কায়া যুদ্ধের একেবারে প্রথম থেকেই গোলাগুলির মাঝখানে আহতদের সেবা করছিল। বিপদ গ্রাহ্য না করে ও কাজ চালাতে থাকে। শেষটায় এক বোমার টুকরোয় নিজেই

গুরুতরভাবে আহত হয়। অপরাপর অনেকের মত তাকেও সেলারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অফিসারদের স্ত্রীরা আহতদের শুশ্রূষা করছিল। কিন্তু দুর্গের অন্যান্য জায়গার মত সেখানেও বাড়তি ব্যান্ডেজ বা ওষুধ ছিল না। ফলে, আহতরা অমানুষিক কষ্ট পায়।

আবার সেই চৌদ্দ বছরের বিউগলবাদক পেতিয়া ক্লিপা সমস্যার সমাধান করল। সে আর তার বন্ধু গোলাগুলির মাঝ দিয়েই চিকিৎসক বিভাগের একটা বিধ্বস্ত ভাঁড়ারে ঢুকে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে কিছু পরিমাণ ওষুধ আর ব্যান্ডেজ বার করল। ছেলেদুটির এই দুঃসাহসের ফলে বহু মানুষ রক্ষা পেল মৃত্যুর হাত থেকে।

ব্রেস্ত দুর্গের আসল বীরাঙ্গনা হল তরুণী সহকারী সার্জন রাইসা আবাকুমভা। প্রথম গোলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে তার বৃদ্ধা মাকে ঘরে রেখে মেডিক্যাল ব্যাগ নিয়ে কেন্দ্রীয় দ্বীপ-গামী পুলের দিকে ছুটে যায়। ওখানটায় শত্রুর গোলা চলছিল বিশেষভাবে প্রচণ্ড। পুলে যাবার রাস্তা আহত লোকে ভর্তি। জার্মানদের গোলা ফাটছে চারদিকে। বুলেটের তীক্ষ্ন আওয়াজ মিলছে মাথার উপর উড়ন্ত বিমানের গর্জন আর পড়ন্ত বোমার প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে। কিন্তু আবাকুমভা আহত সৈন্যদের একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে ছুটে যেতে লাগল, ব্যান্ডেজ বেঁধে তাদের আনতে লাগল নিরাপদ জায়গায়। যখন ব্যাগের সমস্ত ব্যান্ডেজ শেষ হয়ে গেল কেবল তখনই সে কাজে ক্ষান্ত হল।

তারপর তার মনে পড়ল কাছেই অফিসার কোয়ার্টারে রয়েছে নারী ও শিশুরা — ছুটে গেল তাদের খোঁজে। কাছের বাড়িগুলির অফিসারদের স্ত্রী ও শিশুদের জড়ো করে পূব গড়ে — প্রাচীরের কাছে নিয়ে গেল (গড়টি বেশী দূরে নয়)। গড়ের একটি প্রকোষ্ঠে ওরা আশ্রয় পেল। এই দলটির ভার নিল মেজর গাভ্রিলভ, সঙ্গে সঙ্গে সে রাইসা আবাকুমভা ও তার সঙ্গের রমণীদের নির্দেশ দিল আহতদের শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করার জন্য।

এই দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী তরুণী সমগ্র দুর্গরক্ষীদের পরিচিত। ডাক্তার হিসেবে তার দক্ষতা ও রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা ওরা জানে। গোলাগুলি উপেক্ষা করে বহুবার সে পুরোবর্তী অঞ্চলে এগিয়ে গেল — শত্রুর একেবারে সামনে থেকে টেনে আনল আহতদের। গড়ের ভিতর যে ছোট্ট হাসপাতালটি সে গড়ে তুলল ব্যান্ডেজ বা ওষুধ না থাকা সত্ত্বেও সেখানে কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করল। ব্যান্ডেজের জন্য সৈনিকদের শার্ট ছিঁড়ে ফেলা হল, ভাঙা হাড় বসাবার পাতলা তক্তা হিসেবে ব্যবহার করা হল বোর্ডের টুকরো আর ভাঙ্গা রাইফেলের কুঁদা।

কাছাকাছি বাঁধের ভেতর কিছুটা বরফের খোঁজ সৈনিকরা পেতেই রাইসা আবাকুমভা সঙ্গে সঙ্গে হাজির হল সেখানে। এ অতি বিপজ্জনক অভিযান কারণ যে খোলা জায়গার উপর হামাগুড়ি দিয়ে পৌঁছতে হবে সেখানে চলছিল জার্মান মেশিনগানের গুলি। এ সত্ত্বেও আবাকুমভা বহুবার এই


সহকারী সার্জন রাইসা আবাকুমভা, ১৯৪১

বিপদের ঝুঁকি নিল, উদ্দেশ্য আহতদের বুকফাটা তেষ্টা ঐ বরফ দিয়ে মেটান।

রাইসা আবাকুমভা শেষ পর্যন্ত ডাক্তার হিসেবে তার কর্তব্য করে যায়। অনেকদিন বাদে গড়ের অবস্থা যখন চরমে উঠল এবং সেনাপতিরা নারী ও শিশুদের বন্দী হিসেবে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত করল আবাকুমভা ওদের সঙ্গে যেতে রাজী হল না। সে থাকল তার বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে, যাই হোক না কেন আহতদের সঙ্গে থাকাই সে সাব্যস্ত করল।

অবরোধের সময় দুর্গরক্ষীদের বহু অসহ্য পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। সম্ভবত আহত বা সুস্থ উভয়ের পক্ষেই কঠোরতম পরীক্ষা হল পাগল করা অবিরাম জল তেষ্টা। অদ্ভুত মনে হলেও একথা সত্যি যে দ্বীপের উপর তৈরী এই দুর্গের চারপাশে নদীনালা থাকা সত্ত্বেও সেখানে এক ফোঁটা জল নেই।

জার্মান বোমাবর্ষণের প্রথম কয়েক মিনিটের মধ্যেই জল সরবরাহ ব্যবস্থা তচনচ হয়ে যায়। দুর্গের মধ্যে কোন কূপ বা সঞ্চিত জল ছিল না। প্রথম দিন মুখাভেৎস্ ও বুগ থেকে জল আনা সম্ভব ছিল। কিন্তু শত্রু তীর দখল করেই জল আনার সব রাস্তার মুখে নদী তীরবর্তী ঝোপে মেশিনগান পাতল। এখন যে সব বীরের দল মহার্ঘ জল আনার জন্য দুঃসাহসিক চেষ্টা করল তাদের প্রায় সবাই মারা পড়ল। দুর্গ গ্যারিসনের কাছে জল তৃষ্ণা সবচেয়ে সাংঘাতিক সমস্যা এবং তা সমাধান করা অসম্ভব হয়ে উঠল। এমনকি রাত্রিতেও নদীর দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুন বিপজ্জনক। নদীর সমগ্র তীর শত্রুর রকেটের ঝলকে আলোকিত। পাহারাদার কুকুরের মত শত্রুর মেশিনগানচালকরা সতর্ক। নদী তীরবর্তী ঘাসের মধ্যে বিন্দুমাত্র শব্দ বা কম্পন জাগলে প্রচণ্ড গোলা ছোটে।

তবু রাত্রিতে কেউ কেউ জল আনতে সমর্থ হয়। ধাতু নির্মিত সসপেনের হাতল দাঁতে আঁকড়ে হামাগুড়ি দিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে যায়, মাথার উপর রকেট ঝলসে উঠতে সেখানেই স্তব্ধ হয়ে থেমে থাকে। নদীর তীরের কাছে সারি সারি শত্রুর মৃতদেহ ভাসে। সেগুলোকে একপাশে ঠেলে সাবধানে সসপেনে জল ভরে, জলে যাতে এতটুকু আলোড়ন না হয় খেয়াল রাখছে সেদিকে। তার পর যে রাস্তা ধরে এসেছে সেই রাস্তা ধরে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসে। তারপর যখন সে সেই মহামূল্য জিনিষ নিয়ে ব্যারাকের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে কেউ তার আনা জলের দিকে

ফিরেও চায় না—এর এক ফোঁটা জলেও ওদের দাবী নেই। সব জলটুকুই যায় সেলারে শিশু ও আহতদের জন্য। এই কাদাভর্তি ও রক্তলাল এক এক ঢোক জল ওদের জন্য খুব হিসেব করে মাপা হয় একটা জার্মান ফ্ল্যাস্কের মুখ-ঢাকা দিয়ে।

কিন্তু যারা যুদ্ধ করে তাদের জন্য জল নেই। শত্রুর মেশিনগানের গুলির মধ্যেও যখন কেউ প্রতি আক্রমণের জন্য মুখাভেৎসের ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোয় কেবল তখনই দু'একজন দু'এক ঢোক জল গেলার সুযোগ পায়। কিন্তু এ ছাড়া সারাক্ষণই ওরা কষ্ট পায় তেষ্টায়। তাপ, ধুলো ও ধোঁয়া ওদের কষ্ট বাড়ায় হাজার গুণ। ওদের শুকনো গলা দমবন্ধ সংকুচিত, মুখগুলি যেন ধুলিভর্তি চামড়ায় তৈরী, আর্দ্রতাহীন জিভ অসহ্য রকমের খসখসে ও টনটনে। তপ্ত বাতাসের প্রতিটি নিঃশ্বাস ওদের ফুসফুসে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। যদি কোন শ্রান্ত সৈন্য কয়েক মিনিটের জন্য ঝিমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখে জলের, ঠাণ্ডা শ্রান্তিদূরকারী নদী, হ্রদ বা সমুদ্রের। কিন্তু গোলার আওয়াজ বা তার পার্শ্ববর্তী কোন সতর্ক বন্ধুর ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠে যখন বুঝতে পারে এতক্ষণ যা সে দেখেছে তা কেবল স্বপ্ন তখন তার শুধু পাগল হতে বাকি থাকে। কখনো বা এত কষ্ট মানুষের সহ্যশক্তির বাইরে চলে যায়—তেষ্টায় ওরা পাগল হয়ে ওঠে।

সেলারে সঙ্গীন বা ছোরার সাহায্যে কূপ খোঁড়ার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু গর্ত চটপট বুজে যায় এবং গভীরভাবে মাটি

খোঁড়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ৮৪ নং রেজিমেণ্টের অঞ্চলে এ ধরনের একটা অগভীর কূপ থেকে সারাদিনের চেষ্টায় সসপেনেরও কম জল সংগ্রহ করা হয়। এমনকি গুরুতরভাবে আহত লোকদের জন্যও এ জল পর্যাপ্ত নয়। পূবে গড়ের কাছাকাছি এর চাইতেও গভীর একটি কূপ খোঁড়া হয়। কিন্তু দেখা গেল ওটা নর্দমার কাছে, সে জল পানের অযোগ্য।

লোকগুলি বৃষ্টির স্বপ্ন দেখতে থাকে, যেন এটা এক অশ্রুতপূর্ব অলৌকিক ঘটনা। দিনের পর দিন আকাশ মেঘহীন, ধরণীর উপর তপ্ত গ্রীষ্মের ঝলসান রোদ পড়ে নির্দয়ভাবে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। প্রতিদিন ক্লেশকর তৃষ্ণা বেশী করে অসহ্য হয়ে উঠে।

এই ক্লেশ স্বীকার সাংঘাতিক, কিন্তু নারী ও শিশুদের কষ্ট দেখা যুদ্ধরত মানুষগুলির পক্ষে আরও ভয়ঙ্কর। যে সব অফিসারদের সঙ্গে সন্তান, স্ত্রী ও মায়েরা ছিল তারা মরিয়া হয়ে দেখতে লাগল অনশন ও তৃষ্ণায় দিন দিন ওরা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। নির্মম দুঃখে দেখতে লাগল তাদের সন্তানদের ক্ষয়-পাওয়া ক্ষীণ দেহ। ওদের দুঃখ দূর করার জন্য যে কোন আত্মত্যাগেই ওরা প্রস্তুত। বেশীর ভাগ খাদ্য ও জলই শিশুদের দেওয়া হয়। যাতে এ সব শিশুদের দেওয়া যায় এজন্য গুরুতরভাবে আহত লোকরাও তাদের প্রাপ্য স্বল্প খাদ্য ও জল গ্রহণে অসম্মত হল।

বহুবার নারীদের কাছে এই প্রস্তাব করা হল তারা শিশুসহ আত্মসমর্পণ করুক। কিন্তু যতক্ষণ শিশুদের বাঁচিয়ে রাখা

সম্ভব ততক্ষণ তারা এতে সরাসরি অসম্মতি জানাল। ফ্যাশিষ্টদের হাতে বন্দী হওয়া দুর্গরক্ষীদের মত ওদের কাছেও ঘৃণাজনক।

দুর্গের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাছে ফ্যাশিস্টরা একদল নারী ও শিশুকে গ্রেপ্তার করে। এদের ভিতর ছিল ব্যাণ্ডবাদক সার্জেণ্ট-মেজর ইভান জেনকিনের স্ত্রী ও তার চৌদ্দ বছরের মেয়ে ভালিয়া। কাছেই ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের ব্যারাক রক্ষা করছিল পতাপভ ও কিজেভাতভের সৈন্যদল। বন্দীদের পিছনে পাঠাবার আগে একজন জার্মান অফিসার মায়ের কাকুতি-মিনতি উপেক্ষা করে ভালিয়াকে এই দলের ভিতর থেকে বেছে নেয় এবং রাইফেল ও মেশিনগানের গুলি ছোটা ব্যারাক দেখিয়ে মেয়েটিকে এই আদেশ দেয় যে সে গিয়ে দুর্গরক্ষীদের জানাক তারা যদি সেই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ না করে তাহলে তাদের 'ধূলিসাৎ' করা হবে। অফিসার ভালিয়াকে গোলাগুলির মাঝখানে প্রাঙ্গণে ঠেলে দেয়। সে ফাটন্ত গোলা ও ছুটন্ত গুলির ভিতর দিয়ে দৌড়ে যায় বাড়ির দিকে।

ভাগ্যক্রমে দুর্গরক্ষীরা ওকে দেখতে পেয়েছিল। তারা গুলি চালান বন্ধ করে। মেয়েটি মাটির তলার ঘরের জানলায় পেঁছিতে তাকে ভিতরে নেওয়া হয়। সৈন্যরা সঙ্গে সঙ্গে ওকে নিয়ে যায় সিনিয়র লেঃ পতাপভের কাছে। মেয়েটি তাকে নাজিদের শেষ প্রস্তাবের কথা বলে।

কেউ অবশ্য শত্রুর দাবী মানতে রাজী হল না। ভালিয়াকে বলা হল দুর্গরক্ষীদের উত্তর নিয়ে সেই অফিসারের কাছে

ফিরে যেতে পারে, কিন্তু সে রাজী হল না। ওর মা বন্দী থাকা সত্ত্বেও মেয়েটি গোলা-গুলির চাইতে নাজিদের হাতে আটক পড়তে বেশী ভয় পেল। সেলারের মধ্যে যুদ্ধরত লোকদের কাছে আশ্বস্ত বোধ করল। সেখানে থেকে সে নারীদের সঙ্গে আহতদের সেবাকাজে সাহায্য করতে লাগল।



ভালিয়া জেন্কিনা, ১৯৪১

মেয়েরা সৈন্যদের ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে, তাদের সেবা করছে নিজ সন্তানের মত স্নেহ নিয়ে। কেউ কেউ যুদ্ধরত লোকদের গোলাগুলি যোগান দিচ্ছে। এমনকি কেউ কেউ অস্ত্র নিয়ে তাদের স্বামী পিতা বা ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই চালাচ্ছে।

অফিসারের স্ত্রী কমসমল সদস্যা কাতিয়া তারাস্যুকের কাহিনী জানা যায়। সে গ্রাম্য ইস্কুল শিক্ষিকা, যুদ্ধ শুরু হবার কয়েকদিন আগে আসে স্বামীর সঙ্গে ছুটি কাটাতে।

প্রথমটায় কাতিয়া অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে সেলারে আহতদের শুশ্রূষা করছিল। তার স্বামী লেঃ তারাস্যুক ও

সৈন্যরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করছিল। তার লোকদের বেশীর ভাগ যখন অকেজো হয়ে গেল সে নিজেই ভারি মেশিনগানের ভার নিল। একটা বড় গাছের গোড়ার কাছে মেশিনগান বসিয়ে সে স্থিরভাবে তাকসই গুলি চালিয়ে একটার পর একটা শত্রুর আক্রমণ হঠাতে থাকে। এই একক মেশিনগানচালকের উপর মর্টার আর কামান গোলা চলতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত ও দোমড়ান গুঁড়ি ছাড়া গাছটার আর কোন চিহ্নই থাকে না। বহুবার আহত হওয়া সত্ত্বেও সে গুলি চালাতে থাকে। শেষটায় শত্রুর বুলেটে প্রাণ দেয়।

মেশিনগান বেশী সময় স্তব্ধ রইল না। তারাস্যুকের জায়গা দখল করল তারই দলের একজন সৈন্য। কাতিয়া যখন শুনল তার স্বামী মারা গেছে, সে সেলার ছেড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এল ক্ষতবিক্ষত গাছটার কাছে। তখনও মেশিনগান থেকে গুলি চলছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেশিনগানচালকও মারা পড়ল। তখন কাতিয়া নিজেই মেশিনগানের ঢালের পিছনে শুয়ে পড়ে শত্রুর উপর গুলি চালাতে থাকে। শেষটায় এক গোলার টুকরোর আঘাতে তার মৃত্যু হয়। সেই ছিন্ন ও ক্ষতবিক্ষত গাছের গুঁড়িকে, যেখানে কাতিয়া অমন বীরাঙ্গনার মত প্রাণ দেয়, ব্রেস্তের লোকরা নাম দেয় 'সংগ্রামী গাছ'।

দুর্গের বিভিন্ন অঞ্চলে রাইফেল, পিস্তল ও হাতবোমাসহ নারীদের দেখতে পাওয়া যায়। এই সব বীরাঙ্গনাদের নাম অজানা থাকলেও এটা আমরা জানি অনেকেই তারা তাদের

স্বামীদের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম করেছে। দুর্গের উপর হামলাদার শত্রুদের মধ্যে এই গুজব শোনা যায় যে দুর্গ রক্ষায় সোভিয়েত 'নারী ব্যাটালিয়ন' অংশ নেয়। এর কারণ সহজেই অনুমেয়।

বীরদের মৃত্যু

দিন চলতে লাগল একই ভাবে অবিরাম গোলাগুলি, বোমা আর লড়াইয়ের ভিতর দিয়ে। ধোঁয়া আর ধুলির পিছনে প্রতিদিন সকালে সূর্য দেখা দিলে দুর্গরক্ষীদের মনে এই আশা জাগত সম্ভবত ঐদিনই তাদের অগ্নিপরীক্ষার শেষ দিন, হয়ত সেদিনই দীর্ঘ-অপেক্ষিত সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর কামান গর্জে উঠবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় পশ্চিম দ্বীপের ন্যাড়া গাছগুলির পিছনে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে আশাটুকুও দিনের আলোর সঙ্গে শেষ হয়ে যেত।

একেবারে গোড়া থেকেই কিন্তু দুর্গরক্ষীরা সাহায্যের জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা না করে এবং শত্রুর আক্রমণকে কেবলমাত্র না রুখে অবরোধকারী সৈন্য বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টা করেছে। সহর ছাড়িয়ে পূবে বিস্তৃত বেলোরুশিয়ার বিরাট অরণ্য ও অনতিক্রম্য জলাভূমি এবং দুর্গের উত্তর-পূবে বিশ বা ত্রিশ মাইল দূরে বেলোভেজ্স্কায়া পুশ্চার ঘন ঝোপঝাড়ের শুরু। যদি ওরা ঐ সব অরণ্যে পৌঁছতে পারে তাহলে তারা লড়াই চালিয়ে যেতে পারবে, পার্টিজানদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফ্রন্টে পৌঁছবে যুদ্ধ করে।

২৪শে জুন থেকে শুরু করে প্রতিরোধীদের সমস্ত অঞ্চল থেকে জোর করে শত্রু বেষ্টনী ভেদ করার চেষ্টা চলতে লাগল। কিন্তু শত্রু বেষ্টনী শক্তিশালী ও জার্মানরা সতর্ক। কয়েকটি মাত্র ক্ষুদ্র দল অবরুদ্ধ দুর্গের বাইরে যেতে পারল, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাত্রির এই আক্রমণ মেশিনগানের গুলিতে পর্যুদস্ত হত। যারা বেঁচে থাকত ব্যারাকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হত — তাদের সঙ্গীদের বেশীর ভাগেরই কোন খোঁজ পাওয়া যেত না।

৪৪ ও ৮৪ নং রেজিমেণ্টের অঞ্চলে জুবাচিওভ, ফোমিন, সেমেনেন্কো ও বিৎকোর পরিচালনায় বেষ্টনী ভেদের সবচাইতে স্থির প্রতিজ্ঞ ও সংঘবদ্ধ চেষ্টা হয়। স্থির হয় উত্তর ও উত্তর-পূব অঞ্চলে হানা দেওয়া হবে। মুখাভেৎসের তীরে বৃত্তাকার ব্যারাকের উত্তরের অর্ধেকাংশে ২৪শে জুন কেন্দ্রীয় দ্বীপের প্রধান রক্ষীবাহিনীকে জড় করা হল। শুধু দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চল, ক্লাব ও শ্বেত প্রাসাদে রাখা হল কয়েকটি দলকে।

২৫শে জুন সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধরত অফিসার ও সৈন্যদের উদ্দেশ্যে মিলিত দলগুলির অধিনায়ক কর্তৃক প্রচারিত এক যুদ্ধ আদেশনামা পড়ে শুনান হয়। লেঃ ভিনোগ্রাদভকে আদেশ দেওয়া হয় ১০০ থেকে ১২০ জন লোক নিয়ে একটি অগ্রগামী দল তৈরী করে সে যেন ২৬শে জুন অবরোধ বেষ্টনী ভেদ করে সহরের দিকে এগোয়। এই চেষ্টা সফল হলে কেন্দ্রীয় দুর্গের প্রধান বাহিনী ঐ ফাঁক ধরে এগিয়ে যাবে।

লেঃ ভিনোগ্রাদভ তার দলটিকে সংগঠন করল সারা রাত ধরে। সে একজন অভিজ্ঞ অধিনায়ক। ১৯৪০ সালে বীরত্বের জন্য 'অর্ডার অফ দি রেড স্টারে' ভূষিত হয়। দুর্গরক্ষার প্রথম দিকে সে সুচতুর ও স্থিরকল্প- ভাবে কাজ চালায়। দুর্গরক্ষীদের মধ্যে তার যথেষ্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।



লেফ্‌টেনান্ট আনাতোলি ভিনোগ্রাদভ, ১৯৪১

পরের দিন সকালে বেলা ১১টার সময় ভিনোগ্রাদভের দল ত্রিখিলান গেটের কাছে যাত্রা করার জায়গায় জড় হতে থাকে। শত্রু ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করে, সঙ্গে সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনী সেখানে গোলা দাগতে শুরু করে। কিন্তু ভিনোগ্রাদভ সুনিপুণভাবে তার সৈন্যদলকে আড়াল করে ফেলে। দুপুর নাগাদ সবকিছু ঠিক হয়ে যায়। লেঃ ভিনোগ্রাদভ জুবাচিওভ ও ফোমিনকে সে কথা জানায় এবং যাত্রা শুরু করার অনুমতি চায়।

যখন ব্যারাক জানলায় বসান মেশিনগান থেকে মুখাভেৎসের দূরবর্তী তীরে বাঁধের জার্মান সৈন্যদের উপর

গুলি চলতে থাকে তখন ভিনোগ্রাদভ পুলের উপর আক্রমণ চালিয়ে তার দলটিকে নিয়ে ছুটে যায়। বাঁধের কাছে পেঁাছিয়ে দলটি শত্রুর গুলি চালনা স্তব্ধ করে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে মোড় নিয়ে নদীর তীর বরাবর পূব দিকে এগুতে থাকে। প্রচণ্ড প্রতিরোধের সামনে দিয়ে এগুতে হলেও সত্বর ওরা বাইরে চলে আসে। ভিনোগ্রাদভ আশা করতে থাকে যে কোন মুহূর্তে প্রধান বাহিনী তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। কিন্তু ওরা আটকা পড়ে। ভিনোগ্রাদভ তার দলটিকে পূব দিকে চালনা করে।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ সংখ্যা অর্ধেক হ্রাস-পাওয়া ভিনোগ্রাদভের দল মস্কো রাস্তার কাছে ব্রেস্তের দক্ষিণ বহির্ভাগে পেঁাছয়। জার্মান সৈন্যরা দল বেঁধে ঐ রাস্তা ধরে এগুচ্ছিল। তখনও দিনের আলো আছে। শত্রু সৈন্য সঙ্গে সঙ্গে ভিনোগ্রাদভের দলটিকে দেখতে পায়। শত্রুর পদাতিক বাহিনী চারদিক থেকে ওদের দিকে এগোয়, গোলন্দাজরা তাদের কামান সরাসরি তাক করে গোলা চালাতে প্রস্তুত হয় আর পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে প্রায় পনেরটি ট্যাঙ্ক।

দলটি খোলা জায়গায় ধরা পড়ে, তাই বৃত্তাকারে ঘাঁটি দখল করে তারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে লাগল। কিন্তু দুই দলের শক্তিতে আকাশ পাতাল তফাৎ। অল্প সময়ের মধ্যেই দলটি প্রায় সম্পূর্ণ সাবাড় হয়। ভিনোগ্রাদভ নিজে এক বিস্ফোরণে মূর্ছিত আর তার সঙ্গে কয়েকজন লোক আঘাতের ফলে অচৈতন্য হয়ে বন্দী হিসেবে ধরা পড়ে।

কেন্দ্রীয় দ্বীপের প্রধান বাহিনী ভিনোগ্রাদভের দলের পিছনে যেতে পারেনি। জার্মানরা নূতন সৈন্য দিয়ে দ্রুতগতি ফাঁকটাকে ভরাট করে। জুবাচিওভ ও ফোমিনের দল মুখাভেৎস্ পেরুবার চেষ্টা করে, কিন্তু বহু ক্ষয়ক্ষতিসহ ওদের পিছিয়ে আসতে হয়।

কিন্তু অবরোধ বেষ্টনী ভেদ করার পরিকল্পনা ছাড়া হয়নি। রাত্রিবেলা সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা হবে বলে অফিসাররা ঠিক করল। সেই থেকে প্রতি রাতেই দুর্গ থেকে বার হবার চেষ্টা চলতে লাগল।

ভোর হবার ঠিক আগে, রাতের ঘন অন্ধকারে উত্তর ব্যারাকের সীমা বরাবর আক্রমণ চালাবার জন্য গেটের উভয় পাশে দুটি বড় দল সঙ্ঘবদ্ধ হল। একটি দলের পরিচালক রেজিমেণ্ট কমিশার ফোমিন আর একটির পরিচালক সিনিয়র লেঃ বিংকো। একই সঙ্গে জুবাচিওভের নেতৃত্বে ছোট্ট একটি দল মোতায়েন হল উপরের জানলায়, এই আক্রমণকারীদের রক্ষা করবার জন্য গুলি চালান ওদের উদ্দেশ্য।

উল্টোদিকের পার থেকে অবিরাম যে রকেট ঝলসে উঠছে তার চকচকে আলো পড়ছে মুখাভেৎসের নিশ্চল জল এবং জার্মান অধিকৃত বাঁধের কালো সীমানার ওপারে। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীয় দ্বীপের দিকে ছুটে আসছে বুলেটের উজ্জ্বল রেখা, শোনা যাচ্ছে মেশিনগানের খটখট আওয়াজ। কখনো বা মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে ছুটে এসে গোলা ফাটছে দুর্গ প্রাঙ্গণের মাঝখানে। মুখাভেৎসের দিককার

জানলায় এবং গেটের কাছে আক্রমণকারী দল স্তব্ধ হয়ে কান পেতে চেয়ে আছে অপর তীরের পরিলেখের দিকে, অপেক্ষা করছে আক্রমণের আদেশের জন্য। শেষ পর্যন্ত যখন বিদ্যুৎ চমকের মত হুকুম এল সৈন্যদলের কাছে, ওরা ছুটে চলল পুলের উপর দিয়ে, কিংবা ব্যারাকের জানলা দিয়ে লাফিয়ে বার হয়ে মাথার উপর বন্দুক ধরে দ্রুতগতিতে নদী পার হতে লাগল, ওদের পা পিছলে যেতে লাগল কাদাভর্তি নদীর তলদেশে। এতটুকু শব্দ হল না বা একটা গুলিও ছুটল না।

কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রকেটের ঝলকানিতে ওরা শত্রুর নজরে পড়ল। বাঁধের উপরকার সর্বত্র মেশিনগান ঝলসে উঠল। বুলেটের আঘাতে মুখাভেৎসের জল হল ফেনায়িত, পুলের দু'দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড উল্লাস ধ্বনি উঠল আক্রমণকারীদের ভিতর থেকে, আর জুবাচিওভের লোকেরা ব্যারাকের জানলা দিয়ে বাঁধের উপর জার্মান সৈন্যদের দিকে গুলি চালাতে লাগল।

সেই প্রথম আক্রমণকারী দলকে রোখা গেল না। ওরা ডুবে গেল নদীর কালো জলে, লুটিয়ে পড়ল পুলের উপর, কিন্তু বাকি সবাই মৃতদেহ ও আহতদের পাশ কাটিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলির ভিতর দিয়ে ছুটে চলল বাঁধের উপর শত্রুর দিকে সাবমেশিনগান থেকে গুলি চালাতে চালাতে আর হাতবোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে। বাঁধে পেঁছে আক্রমণকারীরা

শত্রুর উপর চালাল সঙ্গীন আক্রমণ, অল্পক্ষণের মধ্যেই লাইন বরাবর স্তব্ধ হয়ে গেল শত্রুর গুলিবর্ষণ।

কিন্তু কাছেই বাঁধের অন্য পাশে মোতায়েন ছিল অতিরিক্ত জার্মান সৈন্যদল। সাবমেশিনগানচালকদের নূতন কোম্পানি ছুটে এল বাঁধের দিকে, শত্রুর সংখ্যাধিক্যের যা ফল তাই ফলতে লাগল। অগ্রগমন হল বন্ধ। দলপতিরা বুঝল আর এগুবার চেষ্টা করলে তার ফল দাঁড়াবে অর্থহীন ও প্রচণ্ড সৈন্যক্ষয়। তাই ওরা বাকি দলটিকে নদীর ভিতর দিয়ে ফিরিয়ে আনল। অকৃতকার্যতা ও সঙ্গীদের মৃত্যুতে হতাশ হয়ে ফিরে এল ব্যারাকে। পরের দিন রাত্রিতে কিন্তু আরও প্রচণ্ড সঙ্কল্প নিয়ে আবার বেষ্টনী ভেদের চেষ্টা করা হল। এই ভাবে পর পর কয়েক রাত ধরে চেষ্টা চলল, কিন্তু প্রতি রাতেই আক্রমণকারীর সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। শত্রুপক্ষ বিপন্ন জায়গায় বেশী করে সৈন্য মোতায়েন করল, অবরোধ বেষ্টনীকে করল আরও বেশী শক্তিশালী। খুব বেশী দাম দিতে হলেও এই ছিল অবরুদ্ধ বাহিনীর শেষ আশা। এই চেষ্টার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় তাদের মনের মধ্যেকার চাপা ভাব — শত্রুর প্রতি তাদের প্রচণ্ড ও অদম্য ঘৃণা এবং এই মরণ-পণ-যুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জ্বালাময়ী ইচ্ছা।

এমন রাত এল যখন সবাই একথা উপলব্ধি করল এই ধরনের আক্রমণ আরও চালালে সমগ্র গ্যারিসন ধ্বংস হবে, ফলে শত্রু দ্রুত দুর্গ দখল করবে। ২৮শে জুন রাতে যে আক্রমণ চালান হয় তাতে ক্ষতি হয় বিশেষভাবে প্রচণ্ড, অর্ধেক

লোকও ব্যারাকে ফিরে আসতে পারেনি। রকেটের ঝলকে ফোমিনের সঙ্গী এক সৈন্য দেখতে পায় তার দাড়িভর্তি গম্ভীর মুখ ভাসছে চোখের জলে। যে কমিশার দিনের পর দিন মুখে প্রশান্ত বিশ্বাসের ভাব ফুটিয়ে রেখেছিল, যে বিশ্বাস অবধারিত সংক্রামিত হয়েছিল তার সৈন্যদলের মধ্যে, সে আজ ক্রোধ ও হতাশায় চোখের জল ফেলছে। সে বুঝেছে লোকদের বাঁচাবার কোন ক্ষমতাই তার নেই, যারা মারা গেছে তাদের জন্য দুঃখ আর যারা এখনও বেঁচে আছে তাদের অদৃষ্টে কী আছে তাই নিয়ে তার ক্ষুব্ধ উৎকণ্ঠা। তাই আজ তার চোখে জল।

আর কেউ এই কান্না লক্ষ্য করেনি। অল্পসময়ের মধ্যেই কমিশার তার সাময়িক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠে, আবার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত গলায় সে নির্দেশ দিতে থাকে। এমনকি একেবারে শেষ পর্যন্ত যখন দুর্গ থেকে বার হবার সব আশাই লুপ্ত এবং গ্যারিসনের সাহায্য পাবার কোন আশ্বাসই আর নেই তখনও কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যাবার একটা উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য হল যত বেশী সময় সম্ভব প্রতিরোধ চালান, শত্রুসৈন্যকে দুর্গ প্রাচীরের সীমানায় আটকে রাখা, ওদের যত লোককে সম্ভব হত্যা করা এবং সবচাইতে বেশী মূল্য দিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন করা।

সেই রাতের পর থেকে ৪৪ ও ৮৪ নং রেজিমেণ্টের অঞ্চলে বেষ্টনী ভেদের সব চেষ্টাই ত্যাগ করা হয়।

বহু সৈন্য নিহত হওয়ার জন্যই শুধু এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, গোলাগুলির স্বল্পতাও তার কারণ। কার্তুজ ও হাতবোমা

জোগাড় করা তখন অবিশ্বাস্যরকমের কঠিন, তবু প্রতিরোধের কাজে এদের বেশী সতর্কভাবে খরচা করা সম্ভব।

আধা ধ্বংস পাওয়া গুদাম ঘরে যে গোলাবারুদ পাওয়া গিয়েছিল শত্রুর অবিরাম আক্রমণ রুখতে গিয়ে তাও সত্বর শেষ হয়ে যায়। যে সব গুদামে আগুন ধরে গেছে এবং যেখানে হামেশাই কার্তুজের বাক্স ফাটছে এমনকি সেখান থেকেও দুর্গরক্ষীরা গোলাবারুদ সংগ্রহ করে। আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে জীবনের পরোয়া না করে জ্বলন্ত স্তূপের ভিতর থেকে ওরা বাক্স টেনে আনে। কিন্তু এভাবে সংগ্রহ করা গোলাবারুদও বেশীদিন টেঁকে না।

প্রতিদিনই গোলাবারুদের অভাব বেশী করে টের পাওয়া গেল। প্রতিটি হাতবোমা, প্রতিটি কার্তুজকে গুণে গেঁথে ব্যবহার করা হল। কোন লোক যদি তার গোলাগুলি ব্যবহার না করেই মারা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গীটি ঐ কার্তুজ বা হাতবোমা নিয়ে নেয়। প্রথম দিন থেকে দুর্গরক্ষীরা শত্রুর মৃতদেহ থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদের থলে সংগ্রহ করে। গোলাগুলির মাঝখান দিয়ে বুকে ভর দিয়ে সামনে এগিয়ে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হওয়া সত্ত্বেও ওরা জার্মান পোষাক-পরা প্রতিটি মৃতদেহ হাতড়ে পোষাকের ওপর থেকে কখনো কখনো যে জলের বোতল বা পকেট থেকে যে খাদ্য পাওয়া যায় তার খোঁজ প্রথমে করে না, সবচেয়ে বেশী যা ওদের দরকার তা হল এক থলে কার্তুজ, একটা সাবমেশিনগান আর কাঠের লম্বা হাতলওয়ালা জার্মান হাতবোমা।

ক্রমশ সোভিয়েত অস্ত্র অকেজো হয়ে পড়ে, কারণ গোলাবারুদের অভাব। বেশীর ভাগ দুর্গরক্ষীরা শত্রুর অস্ত্র দিয়েই শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালায় — এ হল খুঁজে পাওয়া বা প্রতি-আক্রমণে দখল করা জার্মান সাবমেশিনগান। একই অস্বাভাবিক পন্থায় দুর্গরক্ষীকে তার গোলাগুলির অভাব পূরণ করতে হয়। সম্ভবত যুদ্ধের কোন সময়েই এ ধরনের পথ আর বেছে নেওয়া হয়নি।

কার্তুজ কমে এলে দুর্গরক্ষীরা লড়াই বন্ধ করে হটে যাওয়ার ভান করে। আসলে তখন তারা এমন জায়গায় লুকোয় শত্রু যেখানে তাদের দেখতে পাবে না।

এ সময় সাবমেশিনগানচালক শত্রুসৈন্য সতর্কভাবে এগিয়ে আসে, অবিরাম গুলি চালাতে থাকে জানলায়, কিন্তু দেয়াল খুবই পুরু হওয়ায় বাড়ির ভিতর কী হচ্ছে না হচ্ছে দেখা ওদের পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ে, তাই জানলার ভিতর দিয়ে ওরা ছোড়ে হাতবোমা। বিস্ফোরণের ফলে ঘরগুলো কেঁপে ওঠে, বোমার ছুটন্ত টুকরোয় লুকোন জায়গায় কখনো কেউ আহত হয় বা মারা পড়ে। কিন্তু ওরা এর জন্য প্রস্তুত। নিজেরা কোথায় আছে তা জানান দেয় না। শেষ পর্যন্ত সাবমেশিনগানচালকদের যখন এ বিশ্বাস জন্মায় যে দুর্গরক্ষী জায়গা ছেড়ে পিছু হঠেছে ওরা জয়োল্লাস করে জানলা আর দরজার ভিতর দিয়ে ছুটে আসে। তখন পাল্টা আক্রমণ করে দুর্গরক্ষী, শুরু হয় হাতাহাতি লড়াই। শত্রুকে শেষ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ওরা দখল করে।

প্রায়ই এভাবে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও

এও যথেষ্ট নয়, কারণ শত্রুর আক্রমণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাদের কার্তুজের ঘাটতি পূরণ করা কী কঠিন এ কথা জেনে দুর্গরক্ষীরা প্রতিটি বুলেটকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে এবং প্রতিটি গুলি যাতে অব্যর্থ হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়। একবার ফোমিনের অধীনস্থ একজন সৈন্য বলে শেষ কার্তুজটি সে রেখেছে নিজের জন্য। ফোমিন এ কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত সৈন্যদের উদ্দেশ করে বলে :

'না বন্ধুগণ, তোমাদের সর্বশেষ কার্তুজটিও চালাবে শত্রুর উপর। হাতাহাতি লড়াইয়ে আমরা মরতে পারি, কিন্তু প্রতিটি কার্তুজ থাকবে কেবলমাত্র ফ্যাশিস্টদের জন্য।'

জার্মানিরা দক্ষিণ-পূব ব্যারাকের বেশীর ভাগ জায়গা দখল করতে পেরেছিল। ৮৪ নং রেজিমেণ্টের সৈনিকরা এই জায়গা ছেড়ে চলে যায়। ক্লাবভবন ও শ্বেত প্রাসাদের জন্য প্রচন্ড লড়াই হয়। এই দুটি বাড়ি বহুবার হাতবদল হয়। জার্মান ট্যাঙ্ক ঘন ঘন ত্রিখিলান গেটের ভিতর দিয়ে কেন্দ্রীয় দ্বীপের প্রাঙ্গণে ঢুকতে থাকে। এগুলো সোজাসুজি ব্যারাকের কাছে এসে সরাসরি জানলায় গুলি চালাতে থাকে এবং সময় সময় একতলার গুদাম ঘরের চওড়া দরজা দিয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ৪৫৫ নং রেজিমেণ্টের অঞ্চলে একটা ফ্যাশিস্ট ট্যাঙ্ক ব্যারাকের এক অংশের মধ্যে ঢোকে। এর দরজার উপর একজন সোভিয়েত মেডিক্যাল আর্দালি একটা বড় রেড ক্রশ পতাকা টাঙিয়ে দিয়েছিল। দূর থেকে ওটা সহজেই নজরে পড়ে। কংক্রীটের মেঝের উপর শুয়ে ছিল গুরুতর রকমের আহত

লোকরা। দরজার কাছে ট্যাংক দেখে আহত লোকগুলি আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠে। ট্যাঙ্কটা মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা করে শায়িত দেহগুলির উপর দিয়ে সগর্জনে এগিয়ে যায়। ঘরের মাঝখানে পেঁছে হঠাৎ ব্রেক কসে ট্যাংকটা ক্যাটারপিলার ট্রাকের উপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে অসহায় লোকগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে পিষতে লাগল।

দুর্গরক্ষীরা একরোখাভাবে প্রতিরোধ চালালেও শত্রু ক্রমে ওদের পরাজিত করে। প্রতিদিন শত্রুর প্রাধান্য ছাড়িয়ে যেতে থাকে। এ অবস্থায় নারী ও শিশুদের আর দুর্গে রাখার কোন মানে হয় না। আজ বা কাল ওরা ক্ষুধা তেষ্টায় মারা যাবেই অথবা শত্রু প্রতিদিন দুর্গের উপর যে বোমা ফেলছে তাতে নিশ্চিহ্ন হবে। শত্রু যতই নিষ্ঠুর হোক না কেন বন্দী হওয়া যতই তিক্ত ও গ্লানিকর হোক না কেন তবু এই আশা ছিল, শত্রু হয়ত নারী ও শিশুদের হত্যা করবে না। এ জন্য ঠিক করা হল ওদের বন্দী হিসেবে শত্রুর হাতে দেওয়া হবে।

লেঃ কিজেভাতভ খুব বেশী রকম আহত হয়েও তখনো সৈন্য পরিচালনা করছিল। সে ৩৩৩ নং রেজিমেন্টের ব্যারাকের সেলারে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে এলে ওরা সবাই প্রতিবাদ করতে লাগল।

সজল চোখে ওরা অনুনয় জানাল, 'আমাদের নির্যাতনের হাতে সঁপে দেবেন না। ফ্যাশিস্টরা আমাদের মারবেই, তা ছাড়া ওরা আমাদের উপর অত্যাচার করবে। আপনি নিজেই বরং আমাদের গুলি করুন, বাচ্চাদের মেরে ফেলুন।'

কিন্তু কিজেভাতভ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সে জানাল এটা দুর্গ অধিনায়কদের হুকুম।

'কিন্তু তোমরা কী করবে?' জনৈকা রমণী প্রশ্ন করল।

'আমরা আনুগত্যের শপথে বদ্ধ আর এই শপথ আমরা শেষ অবধি পালন করব,' জবাব দিল কিজেভাতভ। 'আমাদের লোকরা যখন পৌঁছবে বলো এই কথা।'

পেতিয়া ক্লিপা বাচ্চাছেলে, তাই তাকেও বলা হল সে নারী ও শিশুদের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু সগর্বে অমত জানিয়ে বলল নিজেকে সে লাল ফৌজের সৈন্য বলে মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই করার জন্য থাকবে কমরেডদের পাশে।

ইতিমধ্যেই তার টিপ যে ভাল এ প্রমাণ সে দিয়েছে, একাধিক ফ্যাশিস্টকে গুলি করে হত্যা করেছে। হাতাহাতি লড়াই ও স্কাউটের কাজে তার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছে। তার অনুরোধ রাখা হল, তাকে থাকতে দেওয়া হল দুর্গে।

সৈন্যরা শ্বেত পতাকা তৈরী করল। মেয়েরা সন্তান কোলে করে বুগের তীরে পৌঁছে শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করল।

৯৮ নং ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী গোলন্দাজ ব্যাটালিয়নের অফিসারদের স্ত্রী ও শিশুরা যে সেলারে আশ্রয় নিয়েছিল সেখানেও একই ব্যাপার ঘটল।

'তোমরা শিশুদের বাঁচাবার চেষ্টা অবশ্যই করবে,' মেয়েদের বলল সিনিয়র রাজনৈতিক সংগঠক নেস্তেরচুক। সে এই অঞ্চলের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ভার নিয়েছিল। 'কিন্তু



সিনিয়র রাজনৈতিক সংগঠক
নিকলাই নেস্তের্‌চুক

তোমরা প্রস্তুত থাকবে যে কোন জিনিষের জন্য — অপমান, বিদ্রূপ, প্রহার, এমনকি মৃত্যু। স্মরণ রাখবে দেশের জন্য এবং সন্তানদের জন্য এ সবকিছুই তোমাদের সহ্য করতে হবে।'

নেস্তের্‌চুকের চৌদ্দ বছরের মেয়ে লিদা দুর্গ অবরোধের প্রথম থেকেই ছিল বাবার সঙ্গে। সে কেঁদে অনুরোধ জানাল তাকে দুর্গে থাকতে দেওয়া হোক। কিন্তু নেস্তের্‌চুক রাজী হল না। লিদা শুনতে পেল বাবা একজন অফিসারকে বলছে:

'না, ওর যাওয়াই ভাল। যখন শেষ অবস্থা আসবে আমি নিজের হাতে ওকে কিছুতেই গুলি করতে পারব না। আমার পিস্তলে মাত্র দুটো কার্তুজ আছে — একটা শত্রুর জন্য, আর একটা আমার।'

অন্যান্য রমণী ও শিশুর সঙ্গে লিদাও আত্মসমর্পণ করল।

যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ক্রমশ বেড়ে চলল। দুর্গ গ্যারিসনকে

সাবাড় করার উন্মাদ আগ্রহে শত্রু ক্ষয়ক্ষতির পরোয়া না করে নূতন সৈন্যদল নাবাতে লাগল।

জুনের শেষ ভাগে ত্রিখিলান গেটের কাছে কেন্দ্রীয় দ্বীপের উত্তরাঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচণ্ড লড়াই চলে। এখানে ফোমিন ও জুবাচিওভের নেতৃত্বে গ্যারিসনের প্রধান সৈন্যদল যুদ্ধ করছিল। পশ্চিমে গেটসংলগ্ন ব্যারাক ঘরের অনেকগুলি দখল করেছিল শত্রুসৈন্য। এখানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছিল বিৎকোর হাতে। শত্রু সাবমেশিনগানচালক সৈন্যদের বৃত্তাকার ব্যারাকের ভিতর দিয়ে আর বেশীদূরে সে এগুতে দেয় না। ব্যারাকের পূব পাশে দৃঢ় ঘাঁটি গাড়ার শত্রুর সমস্ত প্রচেষ্টাকে ফোমিন ও জুবাচিওভের সৈন্যরা ব্যর্থ করে দেয়। এই পাশটা একটা অন্ধ গলি। শত্রু একবার ত্রিখিলান গেটসংলগ্ন বাড়ির প্রথম অংশে ঢুকতে পারলে ওরা সোভিয়েত সৈন্যকে বাড়ির ভিতর দেয়ালের উপর ঠেলে নিতে পারত। সবাই এই বিপদের কথা উপলব্ধি করে, তাই গেটের চারপাশে বাড়ি দখলের লড়াই চলে প্রচণ্ড। দিনের মধ্যে বহুবার জার্মান সাবমেশিনগানচালকরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়, কিন্তু ওরা ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পূবে ব্যারাকের সীমান্ত জুড়ে চিৎকার ওঠে — 'জার্মানিরা পাশের ঘরগুলিতে!' আর সঙ্গে সঙ্গে কোন হুকুমের অপেক্ষা না করে দুর্গরক্ষীরা ঘরগুলোকে শত্রুমুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে হাতাহাতি লড়াই চালায়। দিনের পর দিন চলে এই রকম, আর দেখতে না দেখতে ঘরগুলো জানলা পর্যন্ত জার্মান আর সোভিয়েত সৈন্যের মৃতদেহে ভরে যায়। এমনকি এই মৃতদেহের

স্তূপের উপরও চলতে থাকে সঙ্গীন, হাতবোমা ও রাইফেলের কুঁদার লড়াই। শত্রু অকুস্থান দখল করতে পারে না।

স্যাপার সৈন্যদল পাঠান হয় গেট পর্যন্ত। সাবমেশিনগান-চালকরা আক্রমণ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে এই সৈন্যদল পূব পাশের ছাদ ধরে এগিয়ে যায়। চিমনির ভিতর দিয়ে ফেলা হয় শক্তিশালী বিস্ফোরক।

আর দুর্গরক্ষীদের উপর ধ্বসে পড়ে ছাদ আর দেয়াল। ক্রমশ এক এক গজ করে সমস্ত বাড়িটা পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে, তারই নীচে শেষ হয়ে যায় এই অঞ্চলের শেষ দুর্গরক্ষীরা।

এখানে শত্রুর সাবমেশিনগানচালকদের প্রচন্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বুকের চারপাশে জড়ান রেজিমেণ্টের পতাকাসহ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ৮৪ নং রেজিমেণ্টের কেরাণী ফিওদর ইসাইয়েভ। ফোমিন ও জুবাচিওভের সঙ্গে একত্রে যারা যুদ্ধ করছিল সেই রাজনৈতিক সংগঠক পিওতর কশ্‌কারভ এবং লাল ফৌজের সৈন্য আলেক্সান্দ্র ফিল, ইভান দরফেয়েভ, আলেক্সান্দ্র রেবজুইয়েভ ও আর সকলে আঘাতের ফলে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হয়।

রেজিমেণ্টের কমিশার ফোমিনের অদৃষ্ট আরও মর্মান্তিক। বিস্ফোরণের ফলে হতচকিত ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আধ চাপা অবস্থায় তাকে ও তার কয়েকজন সৈন্যকে জার্মানিরা টেনে বার করে আনে। বন্দীদের চেতনা ফিরলে কড়া পাহারায় পাঠান হয় খোল্‌ম্‌ গেটে। সেখানে ভাল রুশ জানা একজন নাজি

অফিসারের সামনে ওদের আনা হয়। অফিসার সাবমেশিনগানচালকদের হুকুম দেয় ওদের তল্লাশি করার জন্য।

ফোমিনের আদেশমত সৈন্যরা অনেক আগেই তাদের সব দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলেছিল। কমিশার নিজে পরেছিল সাধারণ সৈনিকের প্যাডওয়ালা জ্যাকেট আর টিউনিক, তাতে কোন পদচিহ্ন নেই। দাড়িওলা কাহিল চেহারা, পোষাক ছেঁড়াখোঁড়া — ফোমিনের সঙ্গে বাকি বন্দীদের কোনই প্রভেদ নেই। সঙ্গীরা ভাবল ওকে বাঁচান যাবে।

কিন্তু বন্দীদের মধ্যে ছিল এক বিশ্বাসঘাতক। নিজের লোকের হাতে গুলি খাবার আশঙ্কায় এর আগে শত্রুর দলে ভিড়তে পারেনি। এখন সে মওকা পেয়েছে, তাই ভাবল জার্মানদের সুনজরে পড়া যাক। কৃপাপ্রার্থীর হাসি হেসে দল থেকে বেরিয়ে এসে ফোমিনকে দেখিয়ে অফিসারকে বলল:

'এ লোকটি সাধারণ সৈন্য নয়, মহাশয়। ও একজন কমিশার, একজন গুরুত্বপূর্ণ কমিশার। ও আমাদের শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবার আর আত্মসমর্পণ না করার হুকুম দেয়।'

অফিসার সংক্ষিপ্ত হুকুম জারি করল। সাবমেশিনগানচালকরা ফোমিনকে দল থেকে ধাক্কা মেরে বার করে আনল। বন্দীদের ক্রুদ্ধ বসে-যাওয়া চোখগুলো নির্বাক ঘৃণায় ওর উপর স্থির হয়ে আছে দেখে বিশ্বাসঘাতকের মুখ থেকে হাসি উবে গেল। একজন জার্মান সৈন্য ওকে রাইফেলের কুঁদা দিয়ে খোঁচা মারল। বিশ্বাসঘাতক আবার এসে দাঁড়াল বন্দীদের লাইনে। তার চোখ অস্বস্তিতে চঞ্চল।

স্তূপের উপরও চলতে থাকে সঙ্গীন, হাতবোমা ও রাইফেলের কুঁদার লড়াই। শত্রু অকুস্থান দখল করতে পারে না।

স্যাপার সৈন্যদল পাঠান হয় গেট পর্যন্ত। সাবমেশিনগান-চালকরা আক্রমণ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে এই সৈন্যদল পূব পাশের ছাদ ধরে এগিয়ে যায়। চিমনির ভিতর দিয়ে ফেলা হয় শক্তিশালী বিস্ফোরক।

আর দুর্গরক্ষীদের উপর ধ্বসে পড়ে ছাদ আর দেয়াল। ক্রমশ এক এক গজ করে সমস্ত বাড়িটা পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে, তারই নীচে শেষ হয়ে যায় এই অঞ্চলের শেষ দুর্গরক্ষীরা।

এখানে শত্রুর সাবমেশিনগানচালকদের প্রচন্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বুকের চারপাশে জড়ান রেজিমেন্টের পতাকাসহ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে ৮৪ নং রেজিমেন্টের কেরাণী ফিওদর ইসাইয়েভ। ফোমিন ও জুবাচিওভের সঙ্গে একত্রে যারা যুদ্ধ করছিল সেই রাজনৈতিক সংগঠক পিওতর কশ্‌কারভ এবং লাল ফৌজের সৈন্য আলেক্সান্দ্র ফিল, ইভান দরফেয়েভ, আলেক্সান্দ্র রেবজুইয়েভ ও আর সকলে আঘাতের ফলে পরিশ্রান্ত ও দুর্বল হয়ে শত্রুর হাতে বন্দী হয়।

রেজিমেন্টের কমিশার ফোমিনের অদৃষ্ট আরও মর্মান্তিক। বিস্ফোরণের ফলে হতচকিত ও ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আধ চাপা অবস্থায় তাকে ও তার কয়েকজন সৈন্যকে জার্মানিরা টেনে বার করে আনে। বন্দীদের চেতনা ফিরলে কড়া পাহারায় পাঠান হয় খোলম্‌ গেটে। সেখানে ভাল রুশ জানা একজন নাজি

অফিসারের সামনে ওদের আনা হয়। অফিসার সাবমেশিনগানচালকদের হুকুম দেয় ওদের তল্লাশি করার জন্য।

ফোমিনের আদেশমত সৈন্যরা অনেক আগেই তাদের সব দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলেছিল। কমিশার নিজে পরেছিল সাধারণ সৈনিকের প্যাডওয়ালা জ্যাকেট আর টিউনিক, তাতে কোন পদচিহ্ন নেই। দাড়িওলা কাহিল চেহারা, পোষাক ছেঁড়াখোঁড়া — ফোমিনের সঙ্গে বাকি বন্দীদের কোনই প্রভেদ নেই। সঙ্গীরা ভাবল ওকে বাঁচান যাবে।

কিন্তু বন্দীদের মধ্যে ছিল এক বিশ্বাসঘাতক। নিজের লোকের হাতে গুলি খাবার আশঙ্কায় এর আগে শত্রুর দলে ভিড়তে পারেনি। এখন সে মওকা পেয়েছে, তাই ভাবল জার্মানদের সুনজরে পড়া যাক। কৃপাপ্রার্থীর হাসি হেসে দল থেকে বেরিয়ে এসে ফোমিনকে দেখিয়ে অফিসারকে বলল:

'এ লোকটি সাধারণ সৈন্য নয়, মহাশয়। ও একজন কমিশার, একজন গুরুত্বপূর্ণ কমিশার। ও আমাদের শেষ পর্যন্ত লড়াই চালাবার আর আত্মসমর্পণ না করার হুকুম দেয়।'

অফিসার সংক্ষিপ্ত হুকুম জারি করল। সাবমেশিনগানচালকরা ফোমিনকে দল থেকে ধাক্কা মেরে বার করে আনল। বন্দীদের ক্রুদ্ধ বসে-যাওয়া চোখগুলো নির্বাক ঘৃণায় ওর উপর স্থির হয়ে আছে দেখে বিশ্বাসঘাতকের মুখ থেকে হাসি উবে গেল। একজন জার্মান সৈন্য ওকে রাইফেলের কুঁদা দিয়ে খোঁচা মারল। বিশ্বাসঘাতক আবার এসে দাঁড়াল বন্দীদের লাইনে। তার চোখ অস্বস্তিতে চঞ্চল।

অফিসার আদেশ দিতে সাবমেশিনগানচালকরা কমিশারকে ঘিরে খোল্‌ম্‌ গেটের ভিতর দিয়ে মুখাভেৎসের তীরে নিয়ে চলল। একটু বাদে শোনা গেল সাবমেশিনগানের গুলির শব্দ।

সে সময় গেটের কাছাকাছি নদীর তীরে ছিল আর এক দল সোভিয়েত বন্দী। এদের মধ্যে ছিল ৮৪ নং রেজিমেণ্টের সৈন্য। ওরা কমিশারকে দেখেই চিনতে পারে। দেখতে পেল সাবমেশিনগানচালকরা ফোমিনকে দুর্গ দেয়ালের কাছে দাঁড় করাচ্ছে। ফোমিন হাত তুলে কী যেন বলছে চেঁচিয়ে। কিন্তু গুলির আওয়াজে সঙ্গে সঙ্গে তার গলা গেল ডুবে।

এই ভাবে মৃত্যু বরণ করে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃত সন্তান, ব্রেস্ত দুর্গের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের সংগঠক ও নেতা রেজিমেণ্টের কমিশার ফোমিন।

আধঘণ্টা বাদে অন্যান্য বন্দীদের দুর্গ থেকে মার্চ করিয়ে পাহারা দিয়ে বাইরে আনা হয়। সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় ওদের বুগের তীরে একটা ছোট্ট, ইঁটের তৈরী বাড়িতে রাতের মত আটকে রাখা হয়। কিন্তু পরের দিন সকালে যখন দরজা খুলে সবাইকে বাইরে আসার হুকুম দেওয়া হল জার্মান প্রহরীরা দেখতে পেল একজন বন্দী কম। বাড়ির অন্ধকার এক কোণায় খড়ের গাদার উপর পড়ে আছে একটা মৃতদেহ। এই লোকটাই গতকাল কমিশার ফোমিনকে ধরিয়ে দিয়েছিল। লোকটা শুয়ে আছে মাথাটা পিছনে ঝুলিয়ে, চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আছে ভয়ঙ্করভাবে, গলার উপর নীল আঙুলের স্পষ্ট দাগ। বিশ্বাসঘাতকতার মূল্য সে দিয়েছে।

জার্মানরা অবশ্য ঘটনাটাকে কোনই গুরুত্ব দিল না। বন্দীদের লাইন করে একটা শিবিরে আনা হল। ওরা ক্ষতের যন্ত্রণায় অস্থির, পা ফেলবার শক্তি নেই বললেই চলে। ফিরে চাইছে দুর্গ প্রাচীরের দিকে, ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে তখনও সেটা নজরে পড়ছে। গুলির আওয়াজ ও বিস্ফোরণ বন্ধ হয়নি।

কেল্লা তখনও লড়াই চালাচ্ছে। ব্যারাকের পূর্বাঞ্চল এখন শত্রুর হাতে। কিন্তু শ্বেত প্রাসাদের জন্য চলছিল আরও মারাত্মক লড়াই। ক্লাব রক্ষকরা বেশীর ভাগই মস্কোর লোক। ওরা আগেকার গির্জা ঘরের লম্বা জানলা দিয়ে গুলি ছুড়ে শত্রুর সাবমেশিনগানচালকদের সব আক্রমণ প্রতিরোধ করছিল। কেন্দ্রীয় দ্বীপের সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল দৃঢ়ভাবে রক্ষা করছিল ৪৪ ও ৩৩৩ নং রেজিমেন্টের সৈনিকরা।

সীমান্তরক্ষীদল পশ্চিম দ্বীপে লড়াই চালাতে থাকে। এখানে চৌদ্দ দিন ধরে গুলি চালান হয়। সবদিক থেকে শত্রুর দ্বারা ঘেরাও হলেও উত্তরাঞ্চলের পূব গড় তখনও প্রতিরোধ চালাচ্ছিল। নেস্তের্‌চুক ও আকিমচাকিনের লোকেরা কোব্রিন্‌স্কি গেটের কাছে বাঁধের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে সব কামান অকেজো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও রাইফেল আর সাবমেশিনগান দিয়ে যুদ্ধ করছিল। এই সময়ে কমিউনিস্ট নিকলাই নেস্তের্‌চুক যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়ে বীরের মতো মারা যায়। লেঃ আকিমচাকিন ওর দলটির ভার নেয়। ব্যাটারির কম্যাণ্ডার লেঃ কাগানোভিচ এবং পল্টন কম্যাণ্ডার

লেঃ চেস্নোকভের সঙ্গে হেডকোয়ার্টারের কর্তা যুদ্ধপতাকা ও ব্যাটালিয়নের গুপ্ত দলিলপত্র বাঁধের এক খোপে লুকিয়ে রাখে এবং অবিরাম শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীকে পরিচালনা করে। শত্রুর ক্রমাগত আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে ওরা শেষ গোলাবারুদ ব্যবহার করছিল।

জুনের শেষে পূব গড়ের কাছাকাছি জায়গায় বিশেষভাবে প্রচন্ড লড়াই চলে। অবিরাম ও অধিক পরিমাণ আক্রমণ চালিয়ে জার্মানরা দুর্গের উত্তর ও উত্তর-পূব বাঁধ দখল করে পশ্চিম গড়ের রক্ষাকারীদের একটি কোম্পানিকে মেজর গাভ্রিলভের প্রধান সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এই ঘেরা-পড়া কোম্পানির মধ্যে যারা অবশিষ্ট ছিল তারা কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে, সেখান থেকে যুদ্ধের কলরব আর গড় সংলগ্ন পিলবক্সে বসান মেশিনগানের অবিরাম আওয়াজ শোনা যায়। প্রচন্ড ক্ষতিসহ বাঁধ থেকে হঠে আসা আরও দুটি কোম্পানি গাভ্রিলভের নেতৃত্বে পূব গড়ে পুনর্গঠিত হয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এমন শক্তিশালী করে যে এই মুষ্টিমেয় সৈনিকদের প্রতিরোধ ভাঙবার জন্য জার্মানরা চরম পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়।

জার্মান হেডকোয়ার্টারের অফিসাররা তাদের বিবরণীতে লেখে: 'পদাতিকদের নিয়ে গড়ে ঢোকা অসম্ভব কারণ পাল্লার মধ্যে আসামাত্রই গভীর পরিখা আর ঘোড়ার নালাকৃতি প্রাঙ্গণের ভিতর থেকে চমৎকার তাকসই মেশিনগান ও রাইফেলের গুলিতে মারা পড়ছিল প্রত্যেকে। একটি মাত্র পথ

ছিল—রুশিদের না খেতে দিয়ে আত্মসমর্পণ করানো। ওরা যাতে তাড়াতাড়ি অবসন্ন হয়ে পড়ে এর জন্য প্রয়োজন ছিল সব রকমের উপায় গ্রহণ: যেমন, রুশিরা যাতে পরিখা অথবা প্রাঙ্গণ থেকে বার হয়ে এদিকে ওদিকে না যেতে পারে তার জন্য বড় মর্টার থেকে অবিরাম গোলা চালিয়ে ওদের বিব্রত করা, কাছ থেকে ট্যাঙ্কের গোলা নিক্ষেপ, মেগাফোন থেকে বা প্রচারপত্র ফেলে ওদের কাছে আত্মসমর্পণের আবেদন জানান।'

এই বিবরণীতে পরে যে সব কথা লেখা হয় তা থেকে অবশ্য স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই সব পন্থা যথেষ্ট কার্যকরী হয়নি।

বিবরণীতে বলা হয়: '২৮শে জুন ট্যাঙ্ক এবং কামান থেকে পুব গড়ের উপর গোলা দাগা সত্ত্বেও বাহ্যত বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায়নি। ৮৮ মিলিমিটার বিমান-ধ্বংসী কামান দিয়ে গোলা দেগেও কোন কাজ হল না। তাই ডিভিসনের অধিনায়ক বোমারু বিমানের আক্রমণের জন্য মুখাভেৎস্ বিমানঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ করার নির্দেশ দিল। দেখা গেল বিমান আক্রমণ সম্ভব, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যদলকে একেবারে পশ্চিম গড় পর্যন্ত এবং বাঁধের বাইরে সরিয়ে আনা দরকার। অপরাহ্নে এই অভিযান চলে, সঙ্গে সঙ্গে সতর্কভাবে গুলি চালান হয় যাতে রুশিরা পুব গড় থেকে বার না হতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত ২৮শে তারিখে নীচু মেঘের জন্য বিমান হানা সম্ভব হল না। পুব গড়ের পাশে আবার দৃঢ় বেষ্টনী গাড়া হল। রাত্রিতে পুব গড়কে আলোকিত করার

জন্য দখল করা রুশি সার্চলাইট ব্যবহার করা হয়। রুশিরা তখনো প্রতিটি অসতর্ক চলনের সুযোগ নিয়ে গুলি দাগছে।

'২৯শে তারিখে সকাল ৮টায় বিমান থেকে ৫০০ কিলোগ্রাম ওজনের প্রচুর বোমা ফেলা হয়। কোন রকম ফল ফলেছে বলে মনে হল না। ট্যাংক ও কামান নূতন করে গোলা ছুড়তে লাগল, তবু জায়গায় জায়গায় দেয়াল ধ্বসে পড়লেও কোন কাজ হল না।

'৩০শে তারিখে আক্রমণ শুরু করার জন্য গড়ের চারপাশে পরিখার ভিতর বোতল ও পিপাভর্তি পেট্রোল, তেল ও চর্বি ঢেলে হাতবোমা ও আগুনে-বুলেট দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।'

জার্মান সমর নায়করা বিনয়ের সঙ্গে একটি তথ্য উল্লেখ করতে ভুলে গেছে। এই পেট্রোল বোঝাই বোতল ও পিপা ছাড়াও ওরা গড় প্রাঙ্গণে কাঁদুনে বোমা ছোড়ে। নারী শিশু ও আহতদের সঙ্গে দুর্গরক্ষী ক্ষুদ্র গ্যারিসনকে কয়েক ঘণ্টা সমানে শ্বাসজালি পরে থাকতে হয়। এমনকি ধোঁয়া ও গ্যাসের কুণ্ডলীর মাঝখানেও ওরা যুদ্ধ চালায়, বুলেট আর হাতবোমা দিয়ে শত্রুকে হঠাতে থাকে।

২৯শে তারিখে জার্মানরা দুর্গরক্ষীদের কাছে শেষ প্রস্তাব করে: হয় ওরা এক ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ করবে, নইলে গড় গ্যারিসনকে একেবারে সাবাড় করা হবে। শেষ প্রস্তাবের পর কিছু সময় স্তব্ধতায় কাটে। মেজর গাভ্রিলভ এই সুযোগে পার্টির এক প্রকাশ্য সভা ডাকে।

একমাত্র মেশিনগানচালক ও বাঁধের উপর পর্যবেক্ষণকারীরা ছাড়া প্রায় সমগ্র দুর্গরক্ষীরা জমায়েৎ হয় বাঁধের ভিতরকার বড় একটি ঘরে। একজনার পর আর একজন কমিউনিস্ট দাঁড়িয়ে উঠে এই শপথ নেয় যে সে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করবে, মরবে সেও স্বীকার কিন্তু শত্রুর হাতে ধরা দেবে না। সভায় ঘোষণা করা হয় লোককে পার্টির সদস্য করা হবে। পার্টির বহির্ভূত অনেক অফিসার ও সাধারণ সৈন্য দরখাস্ত দেয় এবং পার্টির দলভুক্ত হয়। লেখার কাগজ ছিল না, তাই সংবাদপত্রের টুকরো এবং এমনকি জার্মান প্রচারপত্রে এই দরখাস্ত লেখা হয়। এই প্রচারপত্রে নাজিরা গড় গ্যারিসনকে আত্মসমর্পণের কথা জানিয়েছে।

এটা অবশ্য স্পষ্ট যে গড় আর বেশীক্ষণ টিঁকবে না। গাভ্রিলভের আদেশক্রমে সমস্ত সামরিক দলিলপত্র নষ্ট করে ফেলা হল যাতে শত্রুর হাতে না পড়ে। ৩৯৩ নং স্বাধীন গোলন্দাজ ব্যাটালিয়নের পতাকা তখনো গড়েই ছিল, সেটিকে মাটির তলায় পোঁতা সাব্যস্ত হল।

সিনিয়র লেঃ শ্রাম্‌কো প্রতিরোধের প্রথম দিন থেকেই জুনিয়র সার্জেণ্ট রোদিয়ন সেমেনিউককে এই পতাকাটির ভার দিয়েছিল। শ্রাম্‌কো মারা যায়, কিন্তু সেমেনিউক তখনো বেঁচে ছিল। সে তার টিউনিকের নীচে বুকের চারপাশে পতাকাটিকে জড়িয়ে রাখে। এখন এটিকে লুকিয়ে ফেলার সময় এসেছে।

সেমেনিউক সযত্নে পতাকাটিকে তেরপলে জড়িয়ে একটা ক্যানভাসের বালতির ভিতর পোঁটলা করে রাখে। এই বালতিটা সে পেয়েছিল কাছেই এক আস্তাবলে। এরপর সে এই বালতিটিকে একটা ধাতুনির্মিত পাত্রের ভিতর রেখে ঘরের মেঝেতে গর্ত করে পতাকাসহ পাত্রটিকে সেখানে রাখে এবং তার উপর মাটি চাপা দিয়ে সযত্নে জায়গাটা যাতে টের না পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করে।

ইতিমধ্যে শত্রুর শেষ প্রস্তাবের সময় শেষ হয়ে যায়। জার্মান গোলন্দাজরা গোলা ছুড়তে থাকে, গড়ের উপর আবার বিমান চক্কর দিতে শুরু করে। সেমেনিউক সত্বর নিজের জায়গায় ফিরে যায়। যুদ্ধ চলতে থাকে।

গড়ে যখন ব্যাপকভাবে বোমা দাগা হয়, যখন একটা বিমান থেকে ১,৮০০ কিলোগ্রাম এক বোমা ফেলা হয় (এর ফলে সমগ্র ব্রেস্ত সহর কেঁপে ওঠে), যখন প্রতিটি গড় ভবন ধ্বংস হয় এবং ভিতরের প্রাঙ্গণ পরিণত হয় আগুনের সমুদ্রে কেবল তখনই জার্মানরা বাঁধ ভেঙে ভিতরের ঘরে ঢুকতে পারে। ওরা নারী শিশু আহত এবং দুর্গরক্ষীদের অবসন্ন কয়েকজনকে বন্দী হিসেবে নিয়ে যায়, কিন্তু তন্নতন্ন করে প্রতিটি ঘরে খোঁজ করেও মেজর গাভ্রিলভ বা তার রাজনৈতিক সহকারীকে দেখতে পেল না। এই রাজনৈতিক সংগঠক সমস্ত অবরোধকালে উদ্যমের সঙ্গে গ্যারিসনের দ্বিতীয় অধিনায়কের কাজ চালায়। শত্রু ভাবল ওরা আত্মহত্যা করেছে।

সর্বশেষ দুর্গরক্ষী

কমিশার ফোমিনের হত্যার পর ক্যাপ্টেন জুবাচিওভের নেতৃত্বে একদল সৈন্য কেন্দ্রীয় দুর্গ থেকে উত্তর দিকে বার হবার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে। কিন্তু তখন উত্তরাঞ্চলে জার্মানদের বেষ্টনী আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এক প্রচন্ড লড়াইয়ে জুবাচিওভের দল পরাজিত হয়। আহত জুবাচিওভ সহ দলের কয়েকজন হয় বন্দী।

প্রায় একই সময়ে লেঃ বিৎকোর লোকরাও শেষ হয়ে যায়। এই দলটি আর গোলাগুলি জোগাড় করতে পারে না, ওদের রসদপত্রও প্রায় শেষ হয়ে যায়। এমন সময় এল যখন বিৎকোর রিভলভারে একটি মাত্র গুলি। ওর বন্ধুরা লক্ষ্য করল বিৎকো ওদের কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করছে। বিৎকো কুবান কসাক, বিশ্বস্ত কমিউনিস্ট এবং অভিজ্ঞ অফিসার। শত্রুর হাতে জীবন্ত ধরা পড়া ওর পক্ষে ঘৃণাজনক। স্পষ্টই বোঝা গেল ভাসিলি বিৎকো স্থির করছে শেষ কার্তুজটি দিয়ে নিজেকে শেষ করবে।

কিন্তু ওর বন্ধুরা ওর মৎলব অনুমান করেছিল। যুদ্ধের ক্ষণকালীন বিরতির সময় বিৎকো যখন এক অছিলায় সেলার ছেড়ে যাবে ওর বন্ধুরা ওকে ঘিরে ধরে অনুরোধ জানায় সে যেন আত্মহত্যা না করে। তারা এই যুক্তি দেখায় ওর মৃত্যুর ফলে লোকরা হতাশ হয়ে পড়বে, আর সবার অদৃষ্টে যা আছে তারও সেই অদৃষ্ট বরণ করা উচিত। বিৎকো কিছুই বলল না, শুধু মাথা নীচু করল। বোঝা গেল এই যুক্তিতে কাজ হয়েছে।



সিনিয়র লেফ্‌টেনাণ্ট ভাসিলি
বিৎকো

এই কথাবার্তা চলার সময় কয়েকজন জার্মানি সাবমেশিনগানচালক মাটির তলার ঘরের জানলায় এসে হাজির হয়। মাথা তুলে বিৎকো জানলা দিয়ে চেয়ে দেখল অগ্রবর্তী সাবমেশিন-গানচালক মাত্র কয়েক পা দূরে।

'ওরে ফ্যাশিস্ট ...' বিৎকো চিৎকার দিয়ে উঠল। 'এই গুলি ছিল আমার জন্য কিন্তু এটা তোর প্রাপ্য।'

রিভলভার তুলে সেখানেই সে জার্মানটাকে সাবাড় করে।

সেদিনই এই দলের বেঁচে থাকা শেষ লোককয়টি বিৎকো, সিনিয়র লেঃ সেমেনেন্‌কো এবং জুনিয়র লেঃ স্‌গিব্‌নেভের নেতৃত্বে মুখাভেৎসের দিকে ছুটে যায়, শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই করে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বার হবার চেষ্টা করে। অসম লড়াইয়ের ফলে দলটি ছত্রভঙ্গ হয়, বন্দী হয় তিনজন। সে রাতে ওদের যখন বুগের অপর তীরে মার্চ করিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, বিৎকো ও স্‌গিব্‌নেভ পালিয়ে যায়। দু'দিন বাদে আহত ও প্রহারজর্জরিত স্‌গিব্‌নেভকে জার্মানরা

তাঁবুতে টেনে নিয়ে আসে। সে তার সঙ্গীদের জানায় পশ্চিম বুগ সাঁতরে পার হবার সময় শত্রুর বুলেটে বিৎকো প্রাণ দেয়।

প্রায় একই সময় ব্রেস্ত দুর্গের আর একজন অপূর্ব সৈনিক সীমান্তরক্ষী লেঃ আন্দ্রেই কিজেভাতভ বীরের মৃত্যু বরণ করে।

সিনিয়র লেঃ পতাপভ ও তার সৈন্যরা কয়েকদিন ধরে তেরেস্পল্ গেট অঞ্চল রক্ষা করে। পশ্চিম দ্বীপ থেকে সাবমেশিনগানচালকদের আক্রমণ হঠাতে থাকে ওরা। কিন্তু গোলাগুলির পরিমাণ খুবই কম। পতাপভও স্থির করে শত্রুচক্র ভেদ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু তার পরিকল্পনা ছিল জুবাচিওভ বা বিৎকোর চাইতে অন্য রকমের। পতাপভ বুঝতে পারল উত্তর দিকে বার হবার চেষ্টা করলে মৃত্যু অনিবার্য। শত্রু ঐদিকে আক্রমণ অপেক্ষা করে প্রধান বাহিনীকে ঐ অঞ্চলে মোতায়েন করেছে। কিন্তু পশ্চিম বা দক্ষিণ দিয়ে কেউ বার হবার চেষ্টা করবে এটা জার্মানিরা আশঙ্কা করে না, তাই ঐ অঞ্চলে ওরা সামান্য সৈন্য রেখেছে। পতাপভ ঠিক করল লোকদের নিয়ে পশ্চিম দ্বীপের পুল পার হয়ে বুগের পার্শ্ববর্তী খাল সাঁতরে হাসপাতাল সংলগ্ন দক্ষিণ দ্বীপে পেঁছিবে। সেখান থেকে ব্রেস্তের দক্ষিণ সামরিক ক্যাণ্টনমেণ্টে যাবে। যুদ্ধের আগে থেকেই ওখানে সোভিয়েত গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক ইউনিট ঘাঁটি গেড়ে আছে। পতাপভের আশা ট্যাঙ্ক ইউনিট তখনও সেখানে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

যথারীতি প্রস্তাব জানাবার পর কেন্দ্রীয় দুর্গের রক্ষীদের যখন 'বিবেচনার জন্য' আধঘণ্টা সময় দেওয়া হয় এবং শত্রু গোলন্দাজ বাহিনী সাময়িকভাবে গোলা দাগা বন্ধ রাখে, সে সময় পতাপভ ও আর যারা বেঁচে ছিল তেরেস্পল্ মিনার সংলগ্ন ব্যারাক পেরিয়ে ছুট মারে। যে মুহূর্তে চরম প্রস্তাবের সময় পেরিয়ে যায় আর জার্মানরা দ্বিগুণ তেজে দুর্গের কেন্দ্রস্থলে বোমা দাগতে শুরু করে সে সময় আদেশ দেওয়া হয়। জানলা দিয়ে বুগের তীরে লাফিয়ে নেবে সমগ্র দলটি নদীর পাশের পুল ও বাঁধ পেরিয়ে পশ্চিম দ্বীপের দিকে ছুট মারে। লোকগুলি একটাও গুলি না ছুড়ে দৌড়তে থাকে। শত্রু সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণটা খেয়াল করেনি। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওরা পুল আর বাঁধের উপর মেশিনগান থেকে গুলি ছুড়তে থাকে ততক্ষণে পতাপভের বেশীর ভাগ লোকই দ্বীপের ঝোপঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ে দক্ষিণ-পূবে চলতে শুরু করেছে। বাঁধের পাশের ঝোপে পেতিয়া ক্লিপা ও কোলিয়া নোভিকভ সহ দলের একাংশ সীমান্তরক্ষীর সবুজশীর্ষ টুপি-পরা একজন লোককে দেখতে পায়। লোকটি শুয়ে আছে পারের কাছে শত্রুর দিকে তাক করা একটা হাল্কা মেশিনগানের পাশে। এক পাশে পড়ে আছে এক গাদা ফাঁকা কার্তুজ, আর এক পাশে বাড়তি গুলির স্তূপ। চারপাশে ধূসর সবুজ ইউনিফর্ম-পরা শবদেহ। এরাই হল এই মেশিনগানচালকের কাজের সাক্ষ্য।

সীমান্তরক্ষী শুয়ে আছে নিশ্চল মড়ার মত। পেতিয়া ক্লিপা ওর কাছে দৌড়ে যেতে সে ধীরে ধীরে মাথা তুলল। ওর

মুখখানা এমন ভয়ঙ্কর যে পেতিয়া হতভম্ব হয়ে থেমে গেল। মুখটি মাটির মত ধূসর, অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষীণ ও দাড়ি বোঝাই। বসে-যাওয়া চোখের তলায় কালো দাগ। স্পষ্টই বোঝা গেল বহুদিন ধরে খাদ্য ও নিদ্রাহীন অবস্থায় সে মেশিনগানের পাশে পড়ে আছে, ওর একমাত্র চিন্তা শত্রুকে এগুতে দেবে না।

পতাপভের লোকরা ওকে ঘিরে ধরল, অনুরোধ জানাল ওদের সঙ্গে যোগ দিতে। কিন্তু মেশিনগানচালক ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে এক অদ্ভুত উদাসীন কণ্ঠে বলল:

'আমি এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যাচ্ছিনে।'

এমন স্বরে সে কথাটা বলল যে সবাই বুঝল ওকে অনুরোধ জানিয়ে লাভ নেই। আর দেরী না করে ওরা ছুটল ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে, কয়েক মিনিটের ভিতর পশ্চিম ও দক্ষিণ দ্বীপের মাঝখান দিয়ে বয়ে-যাওয়া নদীর পার্শ্ববর্তী খালে এসে ওরা জলে ঝাঁপ মারল।

ঠিক সেই মুহূর্তে অপর তীরের ঝোপের ভিতর লুকিয়ে-থাকা জার্মান মেশিনগান থেকে গোলা ছুটল। বুলেটের ঘায়ে বুগের জলে ফেনা উঠল। সাঁতারুদের একের পর একটি মাথা ডুবে গেল জলের তলায়। দূরবর্তী তীরে ঝোপের ভিতর দেখা গেল কুকুর সহ শত্রুর সাবমেশিনগানচালকরা।

পতাপভের বেশীর ভাগ লোকই নদীতে মারা পড়ল। অল্প দু'চারজন যারা সাঁতরে উল্টোদিকের পারে উঠল তারা বন্দী হল শত্রুর হাতে। যারা তখনো জলে নাবেনি পিছন ফিরে ছুটল

পুল আর বাঁধের দিকে, চেষ্টা করল দুর্গে পৌঁছতে, সেখানে হয়ত তখনও যুদ্ধ চালান সম্ভব।

কেন্দ্রীয় দুর্গের রক্ষীদের প্রধান দল সংঘবদ্ধ না থাকা সত্ত্বেও সংগ্রাম চালাতে লাগল। বদলে গেল শুধু যুদ্ধের রূপটা। তখন আর প্রতিরোধ একত্র নয়, দুর্গরক্ষীদের বিভিন্ন দলের মধ্যে সদা যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। প্রতিরোধ ব্যবস্থা যেন ছড়িয়ে পড়েছে অনেক কমসংখ্যক প্রতিরোধ কেন্দ্রে, কিন্তু প্রতিরোধ হয়েছে আরও জোরদার ও হিংস্র। সবাই বুঝতে পেরেছে বেষ্টনী ভেদ করার উপায় নেই। একটিমাত্র পথ খোলা আছে ওদের সামনে — যে কোন ভাবে দুর্গ আঁকড়ে থাকা, যতক্ষণ না পুব থেকে সাহায্য এসে পৌঁছয় বা যতক্ষণ তাদের অস্ত্র ধরার শক্তি আছে।

শত্রুপক্ষের অফিসার ও সৈন্যরা শেষ দুর্গরক্ষীদের এই দৃঢ়সংকল্পে বিস্মিত হল। এ এমনই ব্যাপার যা ওদের পক্ষে সম্পূর্ণ দুর্জ্ঞেয় এবং বুঝতে পারা অসম্ভব। কিসের আশা করছে ওরা, কোত্থেকে পাচ্ছে এই শক্তি? যারা শেষ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল ব্রেস্তের নাগরিকেরা প্রায়ই সেইসব জার্মানি অফিসার ও সৈন্যদের এই প্রশ্ন করতে শুনেছে।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য মনে হয়। মৃত সোভিয়েত সৈনিক আর যারা জীবন্ত ধরা পড়েছে তারা অত্যন্ত রোগা ও সম্পূর্ণ কাহিল। বন্দীরা চলন্ত নরকঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয়, ক্ষুধায় ওদের পা এলিয়ে যাচ্ছে। ওদের দেখে গ্রামের মেয়েরা চোখের জল সামলাতে পারল না। এমন অসহ্য তৃষ্ণায় ওরা

কাতর যে সান্ত্রীরা জল খেতে দিলে ওরা বালতি বালতি জল খেতে পারত। এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে এই মৃতবৎ জীবন্ত লোকগুলি ওদের হাতে অস্ত্র ধরেছে, গুলি চালিয়েছে, হাতাহাতি লড়াই করেছে। অথচ একই মারাত্মক অবস্থায় দুর্গরক্ষীরা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে — গুলি আর হাতবোমা ছুড়ছে, হোঁৎকা চেহারার ৪৫ নং জার্মান হামলাদার ডিভিসনের সাবমেশিনচালকদের রাইফেলের সঙ্গীন দিয়ে গেঁথে ফেলছে, কুঁদা চালাচ্ছে। কোত্থেকে ওরা পাচ্ছে এই শক্তি? এটা শত্রুর বুদ্ধির অগম্য।

ওদের শক্তি কিন্তু প্রায় নিঃশেষিত। সোভিয়েত সৈন্যের বন্দুক ধরার ক্ষমতা নেই বললেই চলে, ক্লান্তিতে চলাচলের শক্তি ওদের প্রায় নেই। যে সংগ্রাম এখন মানুষের সহ্যসীমা পার হয়ে গেছে তাতে শত্রুর প্রতি একমাত্র ভয়ঙ্কর ও জ্বলন্ত ঘৃণা ওদের বল জোগাচ্ছে। ব্রেস্ত দুর্গের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ওরা যে দীর্ঘ ও সাংঘাতিক দিন ধরে কষ্ট সহ্য করেছে তা যেন ওদের ঘৃণার শিক্ষা দিয়েছে। ওদেরই চোখের সামনে গোলা আর বোমায় অসহায় নারী ও শিশু টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, লড়াইয়ে মারা গেছে ওদের বন্ধুবান্ধবরা। এ কথা কোনদিনও ওরা ভুলতে পারবে না, যেমন ভোলা সম্ভব নয় সেই ২২শে জুন রাত্তিরে যখন হিটলারী দস্যুরা আকস্মিক আক্রমণে ওদের জীবন বিধ্বস্ত করে দেয়। ধূসর সবুজ ইউনিফর্ম-পরা এই নরহন্তাদের উপর সোভিয়েত সৈন্যের এমন তিক্ত ও অসহ্য ঘৃণা জন্মেছে যে প্রতিশোধ নেবার আকাংক্ষা ক্ষুধা তৃষ্ণাকেও ছাড়িয়ে গেছে। এই

যে উগ্র মনোভাব এর সঙ্গে মিলে আছে আর সবকিছু— সৈনিকের কর্তব্য বোধ, স্বাধীন সেই মানুষের গর্ব যে নিহত হবে কিন্তু বন্দী হবে না, বিশাল যে সংগ্রামে একেবারে পূবে খানিক দূরে সারা দেশ যোগ দিয়েছে তাতে ওরাও অংশ নিচ্ছে— এই বিবেচনা। সংগ্রামের বিশদ তথ্য না জানা থাকলেও প্রত্যেকেই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছিল এ হচ্ছে জীবনমরণ সংগ্রাম।

দিনের পর দিন জার্মান গোলন্দাজ ও মেশিনগানচালকরা সুসম্বদ্ধভাবে দুর্গের শেষ প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলিকে বিধ্বস্ত করতে লাগল। কিন্তু ওরা অবাক হয়ে গেল এই দেখে যে আবার দুর্গের ভিতর থেকে গোলাগুলি চলছে। ব্যারাক এবং অন্যান্য ঘরের নীচের তলা থেকে, বাঁধের গভীরে সেলার থেকে মেশিনগান আর রাইফেলের গুলি হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছে। ৪৫ নং নাজি ডিভিসনের কবর ক্রমে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। ঘর ও সেলারগুলোকে সযত্নে তল্লাশি করা হল, যে সব বাড়ি থেকে সোভিয়েত সৈন্যরা প্রতিরোধ চালাচ্ছিল তার প্রতিটি ঘরকে ধূলিসাৎ করা হল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই আবার ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে ছুটে এল গুলি। দুর্গরক্ষীদের কয়েকটি দল এমন কয়েক অঞ্চলে ঢুকল যে সব জায়গা বহুদিন ধরে জার্মানরা ভাবছিল পুরোপুরি তাদের দখলে এসে গেছে। একেবারে অপ্রত্যাশিত জায়গায় ফ্যাশিস্টরা গুলিবিদ্ধ হল। দুর্গরক্ষীরা একেবারে নীচু সেলারের মাটির তলার রাস্তা দিয়ে শত্রু কবলিত জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় গিয়ে হাজির হল। জার্মানদের ঐ সব রাস্তা জানা ছিল না।

৮ই জুলাই ৪৫ নং ডিভিসনের অধিনায়করা উচ্চপদস্থ হেডকোয়ার্টারে খবর পাঠাল কেল্লা ফতে হয়েছে। স্পষ্টই তারা বিবেচনা করল বাকি প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলিকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাবাড় করা যাবে। কিন্তু পরের দিন এই সব প্রতিরোধ কেন্দ্রের সংখ্যা গেল বেড়ে, বোঝা গেল লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হবে।

ব্যারাকের পশ্চিম অঞ্চলে, ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের সেলারে এবং কেন্দ্রীয় দ্বীপের এই অংশে দুর্গরক্ষীর দল শত্রুর আওতার বাইরে থেকে গেল। পশ্চিম দ্বীপ থেকে তখনো শোনা যাচ্ছে মেশিনগান আর রাইফেলের গুলি। দুর্গের উত্তরাঞ্চলের পশ্চিম গড় সংলগ্ন পিলবক্স থেকে তখনো গুলি চলছে। আকিমচ্কিনের নেতৃত্বে শেষ গোলন্দাজ সৈন্যরা পুব গেটে মরিয়া হয়ে লড়াই করছে। রাজনৈতিক সংগঠক ভেনেদিক্তভের নেতৃত্বে একদল রাইফেলধারী উত্তর বাঁধের একটি ঘরকে সামলাচ্ছে। পুব গড়ে যেখানে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চলে যাতে কোন জীবন্ত প্রাণীর থাকা সম্ভব নয়, হঠাৎ সেখানে মানুষের সাড়া জেগে ওঠে, এর বাঁধ থেকে হাল্কা মেশিনগানের গুলি ছুটতে থাকে। এরা হল মেজর গাভ্রিলভ ও তার মুষ্টিমেয় সৈন্য। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল এরা।

গাভ্রিলভ বন্দী হয়নি বা নিজেকে গুলি করে মারেনি। দুর্গের বাঁধের ভিতরকার অন্ধ কুঠরীতে সে জার্মান সাবমেশিনগানচালকদের দ্বারা ঘেরা পড়ে। গত কয়েক দিন ধরে এটাই ছিল তার সৈন্য পরিচালনার ঘাঁটি। মেজরের সঙ্গে ছিল একজন সীমান্তরক্ষী। অবরোধ কালে সে ওর সহকারীর

কাজ করে। গ্যারিসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওরা এক ঘর থেকে আর এক ঘরে দৌড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে হাতবোমা আর শেষ কার্তুজ ছোড়ে জার্মানদের উপর। দুর্গ গ্যারিসনের প্রতিরোধ যে বিধ্বস্ত এবং জার্মানিরা বাস্তবিকই যে সমগ্র গড়টি দখল করেছে এটা বুঝতে দেরী হল না। গাভ্রিলভ ও তার সহকারীর কাছে খুব সামান্য গোলাগুলিই আছে, তাই ওরা স্থির করল জার্মানিরা গড় ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত লুকিয়ে থাকবে। তারপর হয়ত বেলোভেজ্‌স্কায়া পুশ্চা জঙ্গলের দিকে এগুন সম্ভব হবে। ওরা আশা করছিল সেখানে সোভিয়েত পার্টিজানরা লড়াই শুরু করেছে।

ভাগ্যক্রমে ওরা লুকোবার নিরাপদ জায়গা পেল। প্রতিরোধের প্রথম দিকে মেজর নির্দেশ দিয়েছিল বাঁধের ভিতর দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ কাটার। একটা ঘরের ইঁটের দেয়ালের ভিতর গর্ত করা হয় এবং কিছু লোক পালা করে সুড়ঙ্গ কাটতে থাকে। দেখা গেল বাঁধটা বালুর গাঁথনি দেওয়া, সুড়ঙ্গের ছাদ ভেঙে পড়ায় কাজটা ছেড়ে দিতে হয়। দেয়ালের গর্তটা অবশ্য থেকে গেল আর এর পিছনে বাঁধের পুরু গাঁথনির ভিতর ছিল এক গভীর গর্ত। পাশের ঘরে তল্লাশকারী জার্মানদের গলা শোনা যেতেই গাভ্রিলভ আর তার সহকারী ঐ গর্তে লুকোবে বলে ঠিক করল।

দুর্গরক্ষীরা যে সরু রাস্তা তৈরী করে গেছে তাতে হামাগুড়ি দিয়ে মেজর ও তার সহকারী ডান ও বাঁ দিকে মাটি খুঁড়ে চলতে লাগল। আলগা বালি সহজেই সরে যেতে লাগল।

ক্রমেই গর্ত থেকে দেয়ালের অপর পাশে বাঁধের ভিতরে ঢুকতে শুরু করল। গাব্রিলভ গেল বাঁ দিকে, সহকারীটি ডাইনে। ধীরে ধীরে ওরা এগুতে লাগল, ছুঁচোর মত পিছনে বালু ফেলে রাস্তা আটকে দিল। প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেলে ঘরে ঢোকে শত্রুসৈন্য। এ সময়ের মধ্যে মেজর ও তার সহকারী ইঁটের দেয়ালের গর্ত থেকে বাঁধের ভিতর প্রায় তিন গজ ঢুকে গেছে।

দেয়ালের ভিতর দিয়েই গাব্রিলভ শুনতে পেল ঘর তল্লাশি করতে করতে জার্মানরা পরস্পরের সঙ্গে কথা কইছে। সে নিশ্বাস রুদ্ধ করে রইল, কারণ শরীর এতটুকু কাঁপলেই ধরা পড়ে যাবে। জার্মানরা স্পষ্টই গর্তটাকে লক্ষ্য করেছে কারণ ওরা সেখানে দাঁড়িয়ে কিছু সময় কী নিয়ে যেন আলোচনা করল। এরপর একজন সাবমেশিনগান দিয়ে এক ঝাঁক গুলি ছুড়ল গর্তটার ভিতর। জার্মানরা একটু সময় স্তব্ধ হয়ে রইল, যখন বুঝল ওখানে কেউ নেই চলে গেল অন্য ঘর তল্লাশি করতে।

গাব্রিলভ কয়েকদিন সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে দেয়ালের গর্তে কাটাল। বাইরে রাত কি দিন তাও সে বুঝতে পারত না। ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রমেই কাতর করে তুলল। পকেটে ছিল শুকনো রুটির দুই টুকরো। এক আধটু কামড়ে খেলেও বেশী সময় তা টিঁকল না। তৃষ্ণাটা সামান্য দূর করার একটা রাস্তা বার করল ইঁটের দেয়ালে জিভটাকে ঠেকিয়ে রেখে। ইঁট ঠান্ডা এবং তার গা ভেজা ভেজা। ঘুম সাহায্য করল ক্ষুধা তৃষ্ণা

ভুলতে, কিন্তু ঘুমোচ্ছে থেকে থেকে, কারণ অসতর্ক নড়াচড়া বা গোঙানির ফলে ধরা পড়ার আশঙ্কা। শত্রু গড়েই আছে, তাদের গলাও শোনা যাচ্ছে। দু'একবার জার্মান সৈন্যরা ঘরেও ঢুকল।

বালির স্তরের ওপাশে তার সঙ্গীটি বেঁচে আছে কিনা গাভ্রিলভ জানে না। ফিস ফিস আওয়াজেও ওকে ডাকতে ভয় পাচ্ছে কারণ শত্রু কাছাকাছিই হতে পারে। এতটুকু ভুল করলে সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে। এখন একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, জার্মানিরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এই হল বাঁচার এবং সংগ্রাম চালাবার একমাত্র উপায়। ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্ত্বেও যুদ্ধের কথা সে কদাচ ভোলেনি, একাধিকবার সযত্নে তার গুলিভর্তি পিস্তল ও পকেটে রাখা কয়েকটি হাতবোমা আঙুল দিয়ে পরখ করল।

ক্রমে জার্মানিদের গলা কম ঘন ঘন কানে আসতে লাগল। শেষটায় সবকিছুই মনে হল চুপচাপ। গাভ্রিলভ ভাবল বার হবার সময় হয়েছে। এমন সময় বাঁধের উপরে মেশিনগান থেকে গুলি চলল। ব্যাপারটা চলেছে ঠিক তার মাথার উপর। শব্দ শুনেই সে বুঝল ওটা রুশি হাল্কা মেশিনগান।

কে এটা চালাচ্ছে — তার দলের লোক অথবা জার্মানরা? কয়েক ঘণ্টা কাটল উৎকণ্ঠিত সন্দেহে। থেকে থেকে অল্প সময় ধরে গুলি চলছে। মেশিনগানচালক গুলি বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এই থেকে গাভ্রিলভ একটা অনিশ্চিত আশায় বুক বাঁধল।

শেষ পর্যন্ত মন স্থির করে চুপিসাড়ে ডাক দিল সঙ্গীকে। উত্তর এল। অন্ধকার ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা। প্রথম কাজ হল ওখানে খোঁড়া একটা কূপ থেকে পেট পুরে জল খাওয়া। তারপর হাতবোমা প্রস্তুত রেখে অপ্রশস্ত দুর্গ প্রাঙ্গণে উঁকি মারল। রাত্রি কাল। উপর থেকে শান্ত স্বর ভেসে আসছে। কথা চলেছে রুশ ভাষায়।

বাঁধের উপর তিনটে হাল্কা মেশিনগান নিয়ে ছিল বার জন সোভিয়েত সৈন্য। গড় যখন দখল করা হয় ওরাও গাভ্রিলভের মত লুকিয়ে থাকে। জার্মানি সাবমেশিনগানচালকরা চলে যেতে লুকোন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে আবার প্রতিরোধ ঘাঁটি গাড়ে। দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে ঘরের ভেতর আর রাতের বেলা শত্রুসৈন্য গড়ের দিকে এগুলে তার উপর গুলি চালায়। জার্মানিরা ভেবেছিল গড়ে আর কেউ নেই। তখনও ওরা ধরতে পারেনি যে গড় থেকেই মেশিনগানের গুলি আসছে, বিশেষ করে সব জায়গা থেকেই থেকে থেকে গুলি ছুটছে। পশ্চিম গড়ের পিলবক্স থেকে তখনও মেশিনগান চলছে, অফিসার কোয়ার্টার থেকে গুলির আওয়াজ শোনা যায় আর গোলা ফাটার আওয়াজের সঙ্গে গুলির শব্দ কখনও জোরাল কখনো বা ক্ষীণভাবে আসে কেন্দ্রীয় দ্বীপ থেকে।

গাভ্রিলভ ভাবল সব দলটিকে নিয়ে বেলোভেজ্স্কায়া পুশ্চাতে ঢুকবে। দিনের বেলা বাঁধের উপর ওরা শুধু একজন চৌকিদার রাখত কিন্তু রাত্রিতে সবাই যেত ওখানে এবং সুযোগ পেলে গুলি ছুড়ত। এই ভাবে চলল আরও কয়েক দিন।

লড়াই বন্ধ হল না। প্রায়ই এসে হাজির হচ্ছে জার্মান সৈন্যদল। কেল্লা ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব। সবচাইতে সাংঘাতিক ব্যাপার ওদের খাবার নেই কিছুই। লোকগুলির যে সামান্য শুকনো রুটি ছিল তা শেষ হয়ে গেছে, ক্ষুধা বেড়ে চলেছে দিনকে দিন। মানুষের শেষ শক্তিটুকু নিঃশেষিত হতে চলেছে। গাভ্রিলভ ভাবল মরিয়া হয়ে দুর্গ থেকে বার হবে, এমন সময় অপ্রত্যাশিত এক ঘটনা তার সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিল।

চৌকিদারের অলক্ষ্যে একদল জার্মান সাবমেশিনগানচালক দিনের বেলা হাজির হল গড়ে। ওরা সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সৈন্যদের দেখতে পেল। গাভ্রিলভ ঘরের এক কোণায় বসে ঝিমোচ্ছিল। এমন সময় বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে চিৎকার শুনতে পেল: 'রুশ, আত্মসমর্পণ কর!' সঙ্গে সঙ্গে হাতবোমার বিস্ফোরণ।

জার্মানরা সংখ্যায় কম। অল্পসময়ের মধ্যে তাদের বেশীর ভাগ মারা পড়ল কিন্তু কয়েকজন গেল পালিয়ে। ঘণ্টাখানেক বাদে গড় ঘেরা পড়ল।

প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করা হল। কিন্তু জার্মানরা হাজির করল মর্টার ও কামান। দেখতে দেখতে দুর্গরক্ষীদের অনেকে মারা পড়ল। এরপর আক্রমণ হল চারদিক থেকে। শত্রু স্রেফ সংখ্যার জোরে জিতে গেল। সাবমেশিনগানচালকরা বাঁধের উপরটা দখল করে নীচের প্রাঙ্গণে ইচ্ছেমত হাতবোমা মারতে লাগল।

আবার দেয়ালের সেই গর্ত হল ওদের আশ্রয়স্থল। কিন্তু এবার ওরা তিনজন — গ্যাভ্রিলভ, তার সহকারী ও আর একজন সৈন্য।

ভাগ্য ভাল তখন রাত হয়ে গেছে। অন্ধকারে ঘর তল্লাশির সাহস হল না জার্মানদের। গাভ্রিলভ বুঝল সকাল হতেই ওরা গড়ের আনাচকানাচ খুঁজে দেখবে এবং তার লুকোবার জায়গাটিও আবিষ্কার করবে। সঙ্গে সঙ্গেই কিছু করা দরকার।

ফিস ফিস করে কথাবার্তা বলে ওরা হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের ভিতর বেরিয়ে এল, দরজার কাছে এসে দেখতে পেল কেউ নেই। প্রাঙ্গণেও জার্মানদের চিহ্ন নেই। কিন্তু গুঁড়ি মেরে গড়ের প্রবেশপথের কাছে এলেই তাদের নজরে পড়ল সামান্য দূরে আগুনের চারপাশে বসে থাকা জার্মান সৈন্য। শত্রু গড়টিকে ঘিরে আছে যাতে একজন দুর্গরক্ষীও না পালাতে পারে। ওরা অপেক্ষা করছে রাত শেষ হবার।

একমাত্র লড়াই করে পালান সম্ভব। ওরা সাব্যস্ত করল গাভ্রিলভের আদেশমত আগুনের চারপাশে বসা জার্মানদের উপর একটা হাতবোমা ছুড়বে আর তিনজন তিনদিকে ছুট মারবে: সহকারী যাবে দক্ষিণে, অফিসার কোয়ার্টারের দিকে, সৈন্যটি যাবে পূবে, বাইরের বাঁধের দিকে আর গাভ্রিলভ যাবে পশ্চিমে — উত্তর গেট থেকে কেন্দ্রীয় দ্বীপে প্রসারিত রাস্তার দিকে। গাভ্রিলভের দিকটা সবচেয়ে বিপজ্জনক, কারণ ঐ রাস্তায় জার্মান সৈন্য হামেশাই যাতায়াত করছে।

ওরা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে এই স্থির করল কেউ যদি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায় সে যাবে তার আকাংক্ষিত জায়গা বেলোভেজ্স্কায়া পুশ্চাতে। অতঃপর গাভ্রিলভ চাপা গলায় হুকুম দিল: 'ছোঁড়!' আর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকে হাতবোমা ছুড়ল।

গাভ্রিলভ স্মরণ করতে পারল না কি ভাবে সে জার্মান চৌকি পেরিয়ে এল। তার শুধু মনে আছে হাতবোমার বিস্ফোরণের আওয়াজ, জার্মান সৈন্যদের চিৎকার, তার মাথার উপর দিয়ে বুলেটের সাঁই সাঁই শব্দ আর রাত্রির সবকিছু ঢেকে দেওয়া গাঢ় অন্ধকার, এখন আগুনের আলোয় তা আরও বেশী গাঢ় মনে হচ্ছে। পিস্তল আর দু'নম্বর হাতবোমা পাকড়ে সে প্রাণপণ ছুটে চলল। পিছনে শুনতে পেল চিৎকার আর ধাবমান পায়ের শব্দ। রাস্তা দৌড়ে পার হবার সময় তার মাথাটা সাফ হল, ভাগ্যক্রমে রাস্তাটা তখন ফাঁকা। দম নেবার জন্য মুহূর্তের জন্য থামতেই তার মাথার উপর দিয়ে সাঁ করে একঝাঁক গুলি চলে গেল।

এই গুলি চালিয়েছে এক অজ্ঞাত সোভিয়েত সৈন্য পশ্চিম গড়ের পিলবক্স থেকে। চিৎকার ও গুলির আওয়াজে সচকিত হয়ে স্পষ্টই আগুনের দিকে নিরীখ করে সে গুলি ছুড়েছে। গুলির হাত থেকে বাঁচার জন্য গাভ্রিলভ একটা ধ্বসে-যাওয়া বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল। জানতে না পারলেও ঐ সোভিয়েত সৈন্য তাকে রক্ষা করল। ওকে যারা অনুসরণ করছিল তারা গুলির আওতায় এল। জার্মানরা যে

চিৎকার করে পেছনে পালিয়ে গেল গাভ্রিলভ তা শুনতে পেয়েছিল।

প্রায় মিনিট পনেরোর মধ্যে সবকিছু আবার চুপচাপ। মাটি ঘেঁষে গাভ্রিলভ বাইরের বাঁধের দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগুল, রাস্তা থেকে ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল।

রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারে একেবারে কাছে আসার আগে সে দেয়ালটা দেখতে পেল না। এ হল বাঁধের ভিতরকার একটা ঘরের ইঁটের দেয়াল। দরজা হাতড়ে ঢুকল ভিতরে। শেষটায় বুঝতে পারল কোথায় এসেছে। যুদ্ধের আগে এটা ছিল দুর্গ গ্যারিসনের গোলন্দাজদের ঘোড়ার আস্তাবল। এসেছে দুর্গের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। খুশি হল কারণ এ জায়গা থেকে বেলোভেজ্‌স্কায়া পুশ্চায় পৌঁছবার রাস্তা সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত।

বাইরে এসে সাবধানে বাঁধের উপর হামাগুড়ি দিয়ে এল পরিখার পারে। পূব আকাশে আলো স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ভোর হতে দেরী নেই। অন্যকিছু করার আগে তীরের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে স্রোতহীন জল পান করল। তারপর রওনা হল অপর পারের দিকে।

হঠাৎ অন্ধকারে জার্মানদের গলা শুনে মৃতবৎ নিশ্চল হয়ে স্থির দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাইল।

ধীরে তার সামনে উল্টোদিকের পারে শত্রু শিবিরের আবছা পরিলেখ স্পষ্ট হয়ে উঠল, তারপর জ্বলে উঠল একটা দেশলাই, দেখা দিল সিগারেটের লাল আভা, দূর তীরে একদল সৈন্য তাঁবু গেড়েছে।

নিঃশব্দে জল থেকে উঠে আবার গঁ্ড়ি মেরে বাঁধের কাছে এল। এখানে দেখতে পেল একটা নীচু দরজা, ভিতরে ঢুকে দেখল এসেছে একটা ছোট্ট কোণার ঘরে। ভিতরে দ্'দিকে গ্লি ছোড়ার দ্টো ঘ্লঘ্লি। ঘর থেকে বাঁধের গভীরে একটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তা ধরে এগিয়ে আবার এল আস্তাবলের ঘরে।

মেজর পিওতর গাভ্রিলভ,
১৯৪১

আলো বেশ স্পষ্ট। দিনের মত একটা ল্কোবার জায়গা চাই। একটু ভেবে কোণার ঘরটাই বেছে নিল। দেয়াল প্র্ আর গ্লি ছোড়ার ছেঁদাদ্টো কাজে লাগতে পারে। জার্মানরা ওকে দেখতে পেলে আত্মরক্ষার ভাল স্যোগ পাবে।

ঘরটা পরীক্ষা করে এমন একটা জিনিষ আবিষ্কার করল যাতে ওর দ্শ্চিন্তা হল। এর ভিতর ল্কোবার কোন জায়গা নেই। জার্মানরা দরজার ভিতর দিয়ে তাকালেই ওকে দেখতে পাবে।

তখন তার মনে পড়ল ঘরের দরজার কাছে খালের পারে অশ্বমল গাদা করা আছে। আস্তাবল সাফ করার সময় এই স্তূপ জমেছিল। সে তাড়াতাড়ি দু'বাহু পরিমাণে অশ্বমল এনে ঘরের কোণায় জড় করতে লাগল। দিন হবার আগেই তার লুকোবার জায়গা তৈরী হল। অশ্বমলের মধ্যে গর্ত করে নিজে তার ভিতর গা ঢাকা দিল, দেখার জন্য একটা ছোট ছেঁদা রাখল, পাশে বাকি পাঁচটি হাতবোমা আর গুলিভর্তি পিস্তল—একটি সোভিয়েত, অন্যটি জার্মান।

পরের দিন সারাক্ষণ রইল ঘরের ভিতর। কাছেই ঘুরে বেড়াচ্ছে শত্রুসৈন্য, কথা বলছে আর খালের পারে কী যেন করছে। একবার একটা দল ঘরের ভিতর দিয়ে আস্তাবলের দিকে গেল। গাভ্রিলভ পিস্তল বাগিয়ে ধরল, কিন্তু ওরা ঘরের কোণায় আবর্জনার দিকে নজর দিল না।

রাতে আবার সে পরিখায় গিয়ে জল খেল। দূর তীরে তখনও দেখতে পেল জার্মান শিবিরের আবছা চেহারা, শুনতে পেল সৈন্যদের গলা। ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বলে ঠিক করল, বিশেষ করে কেল্লায় গোলাগুলি ছোড়া কমে আসছে বলে মনে হয়—শত্রু যে শেষ প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলি সাবাড় করছে এ তারই লক্ষণ।

তিনদিন না খেয়ে কাটাল। এরপর তার এমন খিদে লাগল যে আর সহ্য করা যায় না। মনে হল আস্তাবলের কাছে পশু খাদ্য থাকতেও পারে, হয়ত সেখানে বার্লি বা জই পাবে।

আস্তাবলের কাছে অনেক খোঁজাখুঁজির পর এক কোণায় তার হাতে ঠেকল শক্ত পদার্থ। এক টুকরো কামড়ে দেখল খাওয়া চলে।

এ হচ্ছে ঘোড়ার খৈল। বীজ, তুষ, খড় ও অন্যান্য জিনিষ দিয়ে তৈরী। যাই হোক এতে ক্ষুধা মিটল, খেতেও মন্দ লাগছে না। এখন তার খাবারের ভাবনা নেই, বেলোভেজ্‌স্কায়া পুশ্চার রাস্তার বাধা উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অনেক দিন অপেক্ষা করতে পারবে।

পাঁচ দিন সবকিছুই ঠিকমত চলল। পশু খাদ্য খেতে লাগল আর রাতে পরিখার জল, কিন্তু ছ'দিনের দিন পেটে প্রচণ্ড ব্যথা শুরু হল, বেড়ে চলল ঘণ্টায় ঘণ্টায়, যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল। সারাদিন ও পরের রাত পর্যন্ত সে ঠোঁট কামড়ে আর্তনাদ বন্ধ করল পাছে ধরা পড়ে। এরপর অদ্ভুত তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল, সময়ের সব ধারণাই লুপ্ত হল। জ্ঞান ফিরতে ভয়ঙ্কর দুর্বল বোধ করল, কোনরকমে আঙুল নেড়ে অভ্যাসবশে পিস্তল ও হাতবোমা পরখ করল।

হয়ত সে আর্তনাদ করে জানান দিয়ে থাকবে। হঠাৎ কাছেপিঠে গলা শুনে সে জেগে উঠল। ছেঁদা দিয়ে দেখতে পেল দুজন সাবমেশিনগানচালক স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্চর্য এই, শত্রু দেখামাত্রই গাভ্রিলভের শক্তি ফিরে এল, সমস্ত দুর্বলতা দূর হয়ে গেল। সে জার্মান পিস্তলটায় হাত দিল এবং সেফটি ক্যাচ টিপল।

জার্মানিরা স্পষ্টই ওর নড়াচড়া টের পেয়েছিল। তারা অশ্বমল পা দিয়ে সরাতে লাগল। এমন সময় গাভ্রিলভ পিস্তল তুলে অনেক কষ্টে ট্রিগার টিপল। পিস্তলটা অটোমেটিক, তার অজানতে সব গুলি বেরিয়ে গেল। চীৎকার দিয়ে জার্মানিরা দরজার দিকে ছুট মারল, শোনা গেল ওদের বুটের আওয়াজ।

সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে অশ্বমল ঝাড়া মেরে গাভ্রিলভ উঠে দাঁড়াল। বুঝল এই তার শেষ সংগ্রাম। সৈনিক ও কমিউনিস্টের উপযোগী করে নিজেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করল — প্রাণ দেবে লড়াই করে। নিজের পাশে পাঁচটি হাতবোমা ঠিক করে সোভিয়েত পিস্তল হাতে ধরল।

জার্মানিরা বেশীক্ষণ তাকে অপেক্ষা করতে দিল না। মিনিট পাঁচেকের ভিতরেই জানলার ফাঁকের ভিতর দিয়ে মেশিনগানের গুলি আসতে লাগল, কিন্তু জানলার ফাঁক এমনই যে ঘরের দেয়ালের উপর গুলি লাফিয়ে ওঠা ছাড়া তার আর কোন বিপদ ঘটল না।

এরপর সে শুনতে পেল জার্মানিরা ওকে আত্মসমর্পণ করার জন্য চিৎকার দিচ্ছে। সে অনুমান করল ওরা বাঁধ ঘেঁষে সাবধানে এগিয়ে আসবে তার ঘরের দিকে। খুব কাছাকাছি গলা না পাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করল। এরপর জানলার ফাঁক দিয়ে ডাইনে আর বাঁয়ে দুটো হাতবোমা ছুড়ল। জার্মানিরা ছিটকে পড়ল, আর্তনাদ শুনতে পেল, বুঝল বোমাটা কাজ দিয়েছে।

আধঘণ্টা বাদে আবার আক্রমণ চলল। আবার কিছুটা অপেক্ষা করে সে দুটো হাতবোমা ছুড়ল। জার্মানিরা পিছিয়ে

গেল, কিন্তু এখন তার সম্বল শুধু একটা হাতবোমা আর পিস্তল।

শত্রু কৌশল বদলাল। গাভ্রিলভ জানলার ফাঁক দিয়ে দেখছিল। এমন সময় সাবমেশিনগানের গুলি ছুটল, একজন জার্মান হাজির হল দরজায়। গাভ্রিলভ তার দিকে শেষ হাতবোমা ছুড়ল। শত্রুসৈন্য চিৎকার করে পড়ে গেল। আর একজন জার্মান জানলার ফাঁক দিয়ে সাবমেশিনগানের নল ঢুকিয়ে দিল, কিন্তু গাভ্রিলভ দুবার গুলি ছুড়ল। নল অদৃশ্য হল। ঠিক সে সময় আর এক ফাঁক দিয়ে কী যেন একটা উড়ে এসে মেঝেতে আঘাত করল। একটা প্রবল অগ্নিশিখা, সঙ্গে সঙ্গে গাভ্রিলভ চৈতন্য হারাল...

ব্রেস্তের দক্ষিণে সামরিক ক্যান্টনমেণ্টে জার্মানরা সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দীদের জন্য একটা বড় ধরনের শিবির বানিয়েছিল। ফ্রন্টের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বন্দীদের এখানে আনা হচ্ছিল। ক্ষুধা ও ব্যাধিতে প্রতিদিন শত শত বন্দী মারা যাচ্ছিল এই শিবিরে। এ সত্ত্বেও এর ভিতর একটা হাসপাতাল ছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে যারা ধরা পড়েছে সেই সোভিয়েত ডাক্তাররা কাজ করছিল এখানে। এই ডাক্তারদের ভিতর কয়েকজন যারা বন্দী দশা কাটিয়ে বেঁচে ছিল এবং এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন সহরে বসবাস করছে তারা বলে ১৯৪১ সালের ২৩শে জুলাই, অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বাত্রিংশ দিনে সদ্য ধরা-পড়া একজন সোভিয়েত অফিসারকে হাসপাতালে আনা হয়। লোকটির অবস্থা সাংঘাতিক, দেহের বহু জায়গায় আঘাত, দাড়িবোঝাই মুখ,

ধূলিবোঝাই শরীর, এতই দুর্বল যে খাদ্য গিলবার ক্ষমতা নেই। জীবন রক্ষার জন্য কৃত্রিম উপায়ে তাকে খাওয়াতে হয়েছে। যে সব জার্মান সৈন্য ওকে হাসপাতালে এনেছে তারা জানায় দুর্গের একটা ঘরে যখন ওকে দেখতে পায় এবং বন্দী করার চেষ্টা করে এই লোকটি, যাকে তখনও কদাচিৎ জীবন্ত বলা চলে, প্রচণ্ড বিপদের মধ্যেও ঘণ্টাখানেক লড়াই চালাবার শক্তি রাখে, পিস্তল ও হাতবোমা দিয়ে কয়েক জার্মান সৈন্যকে হত্যা করে।

অফিসারটি হল মেজর পিওতর গাভ্রিলভ।

শত্রু ওর সমর দক্ষতায় এত মুগ্ধ যে, ওকে তারা মারেনি। যে সোভিয়েত মেজর এ ধরনের অভূতপূর্ব সাহস ও মানসিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে হাসপাতালে আনার পর তিনদিন পর্যন্ত ব্রেস্ত থেকে তাকে দেখবার জন্য আসত জার্মান অফিসাররা।

মেজর গাভ্রিলভ কিন্তু একমাত্র শেষ দুর্গরক্ষী নয়। শোনা যায় আগস্ট মাসেও সেলার ও একতলা থেকে গুলি ছোটে, হাতবোমা বিস্ফোরিত হয় এবং বহু শত্রুসৈন্য কেল্লার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে মারা পড়ে। কয়েক দল সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্য নীচু সেলারের গভীরে লুকিয়ে পড়ে। শত্রুর পক্ষে এরা এমন বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় যে যে-দুর্গ তারা দখল করেছে তার ভিতর একা ঢুকতে ভয় পায়। জার্মান অফিসাররা ব্রেস্তের নাগরিকদের বলে যে অবশেষে জার্মান কর্তৃপক্ষ বুগের জল দিয়ে সেলারগুলিকে ভর্তি করার আদেশ দেয়... এই ভাবে

মৃত্যু বরণ করে অপরাজিত শেষ দুর্গরক্ষীরা। নামহীন কিন্তু সেই গৌরবময় প্রতিরোধের মৃত্যুহীন বীর ওরা।

এখনও ব্রেস্তের বাসিন্দা এবং দুর্গের পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদের মুখে শোনা যায় নানা চমকপ্রদ কাহিনী: জার্মানিরা সম্পূর্ণভাবে দুর্গ দখল করার বহু মাস পরেও একক সোভিয়েত অফিসার ও সৈন্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যে লুকিয়ে রাতে মাঝে মধ্যে গুলি চালাতে থাকে। স্থানীয় লোকদের কেউ কেউ বলে ১৯৪১—১৯৪২এর শীতকালে দখলকারী সৈন্য যখন আবর্জনা সাফ করার জন্য দুর্গে লোক নিয়ে যায়, তখনো মাঝেমাঝে তারা দেখে ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে লাল ফৌজের ছেঁড়া ইউনিফর্ম-পরা লোকদের ছুটে যেতে। বহুবার অদৃশ্য হাতে আধা-ধ্বসে-যাওয়া দেয়ালে এই আতঙ্কজনক কথা কয়টি লেখা হয়:

'জার্মান আক্রমণকারীরা নিপাত যাক!'

এরও চাইতেও চমকপ্রদ কাহিনী শোনায় দুর্গরক্ষী আলেক্সান্দ্র্ দুরাসভ। এক সময় সে ছিল ৮৪ নং রেজিমেণ্টের সার্জেণ্ট-মেজর। এখন সে আছে বেলোরুশিয়ার মীগিলিওভ সহরে।

কেল্লার লড়াইয়ে আহত হয়ে সে বন্দী হয় এবং ব্রেস্তের কাছে শিবিরে বহু মাস কাটায়। ১৯৪২এর বসন্তে যখন তার ঘা শুকিয়ে যায় তাকে পাঠান হয় শ্রমিক দলে, জার্মান হাসপাতালের জন্য কাজ করতে।

নাজিরা ইহুদীদের জন্য সহরে যে বসতি গড়েছে সেখান

থেকে একদল ইহুদী এল বন্দীদের সঙ্গে কাজ করতে। বন্দীদের মত ইহুদীদের উপর পাহারা ছিল না। কিন্তু তারা যে আক্রমণকারী ও তাদের লোকদের হাতে কম নির্যাতন সহ্য করেছে তা নয়। এই দলে ছিল একজন বেহালাবাদক। যুদ্ধের আগে সহর রেস্তোরাঁর জ্যাজ দলের সঙ্গে বেহালা বাজাত সে। এখনও সহরের বহু লোকে তার কথা মনে রেখেছে।

দুরাসভের মতে ১৯৪২এর এপ্রিলে একদিন বেহালাবাদক কাজে আসতে দেরী করে। শেষটায় যখন এসে পেঁছয় সে উত্তেজিতভাবে তার ভাগ্যে যা ঘটেছিল তাই বলতে থাকে।

সে আসছিল হাসপাতালের রাস্তা ধরে। এমন সময় ভিতরে বসা একজন অফিসারসহ একটা জার্মান সামরিক গাড়ী তাকে পেরিয়ে যায়। গাড়ীটা হঠাৎ ওর সামনে ব্রেক কসে আর অফিসার বেহালাবাদককে ডাক দেয়।

'ভেতরে এসো!' দরজা খুলে হুকুম দেয় অফিসার।

বেহালাবাদক গাড়ীতে উঠতে সেটা চলে দুর্গের দিকে। তারা যায় কেন্দ্রীয় দ্বীপের দিকে। বেহালাবাদক দুরাসভকে যা বলে তা ধরলে যেখানে ৩৩৩ নং রেজিমেন্টের ঘাঁটি ছিল গাড়ীটা থামে তারই কাছাকাছি কোন জায়গায়।

ধ্বংসস্তুপের মধ্যে একটা গভীর গর্ত খোঁড়া হয়েছে। এরই চারপাশে সাবমেশিনগান তাক করে দাঁড়িয়ে আছে একদল জার্মান সৈন্য।

অফিসার বেহালাবাদককে হুকুম দিল: 'তোমাকে এর ভিতর ঢুকতে হবে। এই সেলারের মধ্যে এখনও একজন রুশি

লুকিয়ে আছে। গুলি ছুড়ছে সে, আত্মসমর্পণ করতে চায় না। তুমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বার করে এনে আমাদের হাতে দেবে। আমরা শপথ করছি ওকে মারব না। এ কাজ করতে না পারলে তোমার ফিরে আসার দরকার নেই, কারণ আমি তোমাকে গুলি করব।'

কষ্টেসৃষ্টে বেহালাবাদক গর্তের মধ্যে নেবে দেখল সেখানে মাটির নীচে অন্ধকার রাস্তা। সে হাতড়ে চলল সেই রাস্তায় আর সমানে চিৎকার করে বলতে লাগল সে কে এবং কেন সেখানে এসেছে যাতে অজ্ঞাত সোভিয়েত সৈন্য তাকে গুলি না করে।

হঠাৎ একটা গুলি ছুটতে বেহালাবাদক আতঙ্কে রাস্তার মেঝের উপর সটান শুয়ে পড়ল। তখন তার কানে এল সামনে কোন জায়গা থেকে কে যেন ক্ষীণ কণ্ঠে বলছে:

'এখানে এসো, ভয় পেও না। আমি শূন্যে গুলি ছুড়েছিলাম। ঐ আমার শেষ কার্তুজ। আমি বাইরে আসব বলে ঠিক করেছি, আমার খাবার ফুরিয়ে গেছে। কাছে এসে আমাকে উঠতে সাহায্য কর।'

বেহালাবাদক উঠে সামনে এগুল। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হল দেয়ালের কাছে বসে-থাকা একটি লোকের সামনে। লোকটি বেহালাবাদককে জড়িয়ে ধরে টেনে কোনোরকমে উঠে দাঁড়াল। দুজনে তখন সেলারের মুখে এগিয়ে চলল, লোকটি সারা শরীরের ভার দিয়েছে বেহালাবাদকের কাঁধে।

গর্ত থেকে টেনে হিঁচড়ে বার হতেই অজ্ঞাত সৈনিকটি চোখ বুজে সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পাথরের উপর এলিয়ে পড়ল।

জার্মানরা অর্ধবৃত্তাকারে ওর পাশে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ কৌতূহলে ওকে নিরীখ করতে লাগল। লোকটি অবিশ্বাস্য রকমের রুগ্ন ও কাহিল। মুখে এক গাদা দাড়ি, বয়স বলা মুশকিল। পোষাক শতছিন্ন, অফিসার বা সৈন্য তা অনুমান করাও সম্ভব নয়।

দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না লোকটি, তাই উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথাই চেষ্টা। অফিসারের হুকুমমত একজন সৈন্য একটিন মাংস আর বিস্কুট তার সামনে রাখল, কিন্তু খাদ্য সে স্পর্শও করল না। অফিসারটি তখন জিজ্ঞেস করল সেলারে আর কোনও রুশি আছে কি না।

অজ্ঞাত সৈনিকটি উত্তর দিল, 'না, আমি একাই ছিলাম। আমার বাইরে আসার একমাত্র কারণ তোমরা আমাদের এই রাশিয়ায় কত অসহায় তাই দেখা। আমি শেষ কার্তুজ শূন্যে ছুঁড়েছি, তবু তোমরা আমাকে গুলি করতে সাহস পাচ্ছ না।'

অফিসার একজন সৈন্যকে হুকুম দিল বেহালাবাদককে কেল্লার বাইরে নিয়ে যেতে। তারপর সেই বন্দীর কি ঘটল কিছুই জানা যায়নি।

কে সেই শেষ বীরপুরুষ যে ব্রেস্ত কেল্লার সেলারে কাটিয়েছে দশ মাস? কী করে সে বেঁচেছিল বা যুদ্ধ করেছিল? পরে তার কী হল? হয়ত চিরদিনই তা রহস্য থেকে যাবে। এই রহস্যের মধ্যেই কিন্তু সেই মহান ও মর্মন্তুদ বীরত্বের ছাপ যার দ্বারা ব্রেস্ত কেল্লা প্রতিরোধের সমগ্র কাহিনীটি চিহ্নিত। সেই উদ্দীপনাময় গোপন তথ্য সবেমাত্র প্রকাশ পেতে শুরু করেছে।

জনগণের স্মৃতি

ইতিহাসই মানুষের স্মৃতি। কিন্তু স্মরণ রাখতে হলে ঘটনা জানা চাই। যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাস ব্রেস্ত কেল্লায় কী ঘটেছিল তা লোকের কাছে অজানা ছিল দীর্ঘ দিন, কিংবা তাদের কাছে যে খবর আসত তা অর্ধ বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী।

১৯৪১এর গ্রীষ্মে যখন সমগ্র ফ্রণ্টে সোভিয়েত সৈন্য শত্রুর চাপে মস্কোর দিকে সরে আসে তখন থেকে থেকে এই ধরনের ভাসা ভাসা গুজব শোনা যায়, যে জার্মানিদের পিছনে ঠিক ব্রেস্ত সীমান্তের কাছে শত্রু বেষ্টনীতে আটকা পড়ে কয়েকটি সোভিয়েত ইউনিট জন্মভূমির প্রথম কয়েক গজ জমির ওপর দীর্ঘ দিন ধরে একরোখা ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাচ্ছে। যারা শত্রু বেষ্টনী ভেদ করে ফ্রণ্ট পেরিয়ে আসে তাদের মুখে মুখে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সোভিয়েত নৈশ বোমারু বিমানের বৈমানিকরা এই গুজবের সমর্থন জানায়। শত্রুর পিছনের ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণের জন্য উড়ে যাবার সময় এরা সহর থেকে সামান্য দূরে অবিরাম অগ্নিকাণ্ডের আভা দেখতে পায়, অন্ধকার ভেদ করে ফুটে ওঠে বিস্ফোরণের ঝলকানি আর বুলেটের উজ্জ্বল রেখা।

কিন্তু কোন সৈন্যদল সেই বুগের তীরে লড়াই চালাচ্ছে, সংখ্যায় তারা কত, সেই অসম সংগ্রামে তাদের অবস্থা কী দাঁড়াচ্ছে—এ সবকিছুই থাকে অজানা, কারণ কেল্লার সঙ্গে বেতার যোগাযোগ ছিল না। যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে পর পর

যে সব সাঙ্ঘাতিক ঘটনা ঘটতে থাকে তাতে ব্রেস্ত কেল্লার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের কথা লুপ্ত হয়ে দাঁড়ায় লোকমুখে প্রচারিত উপকথা। তাও আবার নূতন লড়াই ও নূতন অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ডুবে যায়।

ন'মাস কেটে যাবার পর ওরিওল অঞ্চলের এক ফ্রণ্টে সোভিয়েত অফিসাররা যখন ৪৫ নং জার্মান পদাতিক ডিভিসনের আটক পড়া কাগজপত্র পরীক্ষা করে তখন তার ভিতর দেখতে পায় 'ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক দখলের যুদ্ধ বিবরণী'। ঐ ৪৫ নং ডিভিসনকে সবেমাত্র সাবাড় করা হয়েছে। ঐ বিবরণীতে ১৯৪১ সালের জুন মাসের শেষভাগে ব্রেস্ত কেল্লার দৈনন্দিন সংগ্রামের কথা লেখা আছে। বিবরণীতে প্রকাশ পায় যে সোভিয়েত গ্যারিসন ন'দিন ধরে কেল্লা দখলে রাখে এবং শেষ পর্যন্ত ১লা জুলাই কেল্লার যাবতীয় অবরোধ চূর্ণ হয়। সেই নীরস সরকারী দলিল ভাল করে পড়লে এ কথা বেশ টের পাওয়া যায় যে সোভিয়েত ভূমির সেই প্রথম কয়েক গজ জমির উপর যে বীরত্বপূর্ণ দৃঢ়তা ও স্থির সঙ্কল্পের পরিচয় ওরা দেয় তাতে শত্রু সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারেনি। পশ্চিম ইউরোপের বিজয় অভিযানে এই দৃঢ়তার সম্মুখীন কোথাও হয়নি ওরা। বিবরণীর শেষ পরিচ্ছেদে একটি সুস্পষ্ট স্বীকৃতি আছে:

'বীর গ্যারিসন যে কেল্লা রক্ষা করছে তার উপর সংখ্যাধিক্যের আক্রমণে প্রচুর প্রাণহানি হয়। ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক দখল করতে গিয়ে এই সহজ সত্য আবার প্রমাণিত হল...

ব্রেস্ত-লিতোভ্স্কে রুশিরা অসাধারণ দৃঢ়তা ও স্থির সংকল্প নিয়ে লড়াই করে, তারা চমৎকার পদাতিক শিক্ষা ও প্রতিরোধের অত্যাশ্চর্য মানসিক বলের পরিচয় দেয়।'

'ব্রেস্ত-লিতোভ্স্ক দখল সম্পর্কে যুদ্ধ বিবরণীর' রুশ অনুবাদ হয় এবং ১৯৪২ সালের ২১শে জুন 'রেড স্টার' সংবাদপত্রে 'ব্রেস্ত এক বছর আগে' নামক প্রবন্ধ ছাপা হয়। এর মধ্যে থাকে ধরা-পড়া জার্মান দলিলপত্রের উদ্ধৃতি।

আসলে জার্মানরাই এভাবে ব্রেস্ত কেল্লার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের প্রাথমিক বিশদ বিবরণ দেয় সোভিয়েত লোককে। যা ছিল ভাসা ভাসা কাহিনী তা সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। এখনও তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট নয়, কিন্তু জাতির হৃদয়ে তা এর মধ্যেই প্রিয় ও উদ্দীপনাময় হয়ে উঠেছে।

কেটে গেল আরও দু'বছর। ১৯৪৪ সালের ২৮শে জুলাই বেলোরুশিয়ার বিভিন্ন সোভিয়েত ফ্রণ্ট থেকে যে বিরাট প্রতিআক্রমণ শুরু হয় তাতে সোভিয়েত সৈন্যদল ব্রেস্ত মুক্ত করে কেল্লায় ঢোকে।

কেল্লাটি প্রায় ধূলিসাৎ। ধ্বংসের চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কী উগ্র আর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে সেখানে। কেল্লার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছিল একটা মহিমান্বিত দৃঢ়তা, যেন ধরাশায়ী দুর্গরক্ষীদের অপরাজিত মনোবল তখনো বেঁচে আছে। জায়গায় জায়গায় কঠোর-মূর্তি পাথরের স্তূপ আধগজা ঘাস আর ঝোপঝাড়ে ঢাকা, বুলেট আর বোমার টুকরোয় ক্ষতবিক্ষত। এরা যেন গত যুদ্ধের রক্ত আর আগুনকে শুষে

নিয়েছে। যারা এখন এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মনে হল এই পাথরগুলি কত কিছু প্রত্যক্ষ করেছে, হঠাৎ যদি অবাক কিছু ঘটে এবং এরা কথা কইতে পারে তাহলে কত কিছুই না এরা বলে দিতে পারে।

সত্যিই তেমনি অবাক কিছু ঘটল। হঠাৎ পাথরগুলি কথা বলে উঠল। তখনও যে সব দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে তার অংশবিশেষে, দরজা জানলার কাঠামোয়, মাটির নীচের খিলানে, পুলের পোস্তায় দুর্গরক্ষীদের লেখা দেখা দিল। কোনোটায় স্বাক্ষর আছে, কোনোটায় বা নেই, কোনোটা তাড়াতাড়ি পেন্সিলে লেখা, কোনোটায় সঙ্গীন বা বুলেটের আঁচড় — সবকিছুর ভিতর দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই চালাবার প্রতিজ্ঞা জানিয়েছে দুর্গরক্ষীরা, পাঠিয়েছে ওদের শেষ অভিনন্দন দেশ ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে, জনগণ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি প্রকাশ করেছে তাদের নিষ্ঠা। যেন ১৯৪১ সালের বীরদের জীবন্ত কণ্ঠস্বর এরা। এই কণ্ঠস্বরের মধ্যে আছে কর্তব্য সম্পাদনের গৌরব, জীবন থেকে বিদায় নেবার বেদনা, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত বীর্য এবং প্রতিশোধের আহ্বান। দুঃখ ও গভীর আবেগে তা যেন শুনতে পাচ্ছে ১৯৪৪ সালের সৈন্যদল।

'আমরা ছিলাম পাঁচজন: সেদভ, ই. গ্রুতভ, বগলিউব, মিখাইলভ, ভ. সেলিভানভ। আমরা প্রথম আক্রমণের জবাব দিই ১৯৪১, ২২শে জুনে। মরব কিন্তু পিছু হঠব না!' তেরেস্পল্ গেটের কাছে বাইরের দেয়ালের ইঁটে খোদাই করা এই কথাগুলি।

'১৯৪১, ২৬শে জুন। ছিলাম তিনজন। কঠিন সময় কিন্তু সাহস আমরা হারাইনি — মরব বীরের মত!' ব্যারাকের পশ্চিম অঞ্চলে একটা ঘরের দেয়ালে লেখা এই কথা।

গির্জা গায়কদের গ্যালারীতে, ক্লাব হবার পর যেখানে ছিল সিনেমা অপারেটরের আসন সেখানে লেখা পাওয়া যায়। পরে দেয়াল থেকে ঐ লেখা তুলে নিয়ে রাখা হয় একটি যাদুঘরে: 'আমরা তিনজন ছিলাম মস্কোর লোক: ইভানভ, স্তেপান্ চিকভ, জুন্ তিয়ায়েভ। আমরা রক্ষা করি এই গির্জাকে এবং শপথ নিই এখান থেকে আমরা যাব না। জুলাই ১৯৪১।' এই লেখার নীচে ছিল আর একটি লেখা: 'একমাত্র আমিই বেঁচে আছি। জুন্ তিয়ায়েভ আর স্তেপান্ চিকভ মৃত। জার্মানরা গির্জার ভিতর। একটি হাতবোমা অবশিষ্ট, কিন্তু আত্মসমর্পণ নয়। আমাদের হত্যার প্রতিশোধ নিও, কমরেডরা। ১৯৪১।'

পাথররাই যে শুধু কথা কইল তাই নয়। ব্রেস্ত এবং আশপাশের অঞ্চলে এমন লোক ছিল যারা ১৯৪১এর জুন-জুলাই মাসের ঘটনা দেখেছে বা তাতে অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে ছিল মৃত অফিসারদের স্ত্রী ও সন্তানরা। দুর্গাবরোধের সময় এরা ছিল তাদের স্বামী ও পিতার সঙ্গে, পরে জার্মান বন্দী শিবিরে বীভৎস অত্যাচার সহ্য করে। ওরা বহু দুর্গরক্ষীদের নাম জানায়। কেল্লার লড়াইয়ের বহু ঘটনা ও বিশদ তথ্য এদের স্মরণে আছে।

এমন সময় তথ্যগত অদ্ভুত বৈষম্য ধরা পড়ে। ১৯৪২ সালে ৪৫ নং পদাতিক ডিভিসনের হেডকোয়ার্টারে ধরা-পড়া



গ্যারিসন ক্লাবের একটি দেয়ালের ওপর হাতের লেখা

জার্মান সামরিক দলিলে উল্লেখ করা হয় ১৯৪১এর ৩০শে জন দুর্গের পতন ঘটে, কিন্তু এ সত্ত্বেও যারা দুর্গে ছিল আর যারা দূর থেকে লড়াই লক্ষ্য করে সবাই নিশ্চিতভাবে বলে লড়াই চলে অনেকদিন বেশী এবং শেষ হয় কেবল সেই জুলাইয়ের শেষভাগে অথবা বলা চলে আগস্টের প্রথমে। কোন কোন রমণীরা বন্দী হয় কেবল ১৪ — ১৫ই জুলাইয়ে।

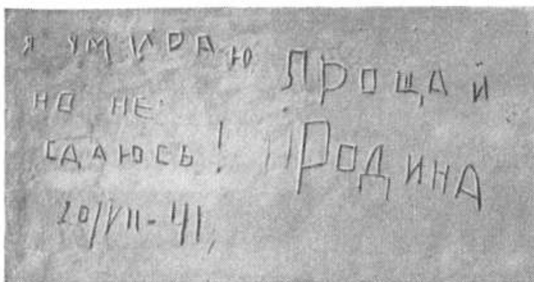
তাদের স্পষ্ট স্মরণে আছে ওদের যখন প্রহরীরা মার্চ করিয়ে নিয়ে যায়, দুর্গের বিভিন্ন জায়গায় আগেরই মত তীব্র যুদ্ধ চলতে থাকে। ব্রেস্তের নাগরিকরা একথা সমর্থন করে যে জুলাইয়ের শেষ দশদিনেও জার্মান কামানের বজ্রনির্ঘোষ আর মেশিনগানের আওয়াজ শোনা যায় এবং সহরে জার্মান সামরিক হাসপাতালে আহত সৈন্য ও অফিসারদের আনা হয়। এক কথায় প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে ৪৫ নং ডিভিসনের বিবরণ মত দুর্গ এক সপ্তাহ দাঁড়িয়ে থাকেনি, এক মাসেরও বেশী আত্মরক্ষা করে।

কোন সরাসরি বাস্তব সাক্ষ্য অবশ্য এ কথার প্রমাণ হিসেবে পাওয়া যায়নি। দুর্গরক্ষীরা প্রাচীরে যা কিছু লিখে গেছে তার তারিখ নির্দিষ্ট নয়, শুধু লেখা 'জুন' বা 'জুলাই ১৯৪১'। কোন কোন লেখার নীচে তারিখও নেই। একমাত্র ১৯৫২ সালেই ব্যারাকের অবশিষ্ট দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ঘরের মধ্যে মস্কোর যাদুঘরের জনৈক কর্মী, প্রায় উদ্ধার করা যায় না, এই রকমের কয়েকটি অক্ষর আবিষ্কার করে। একজন অজ্ঞাত সৈনিক প্ল্যাসটারের উপর আঁকাবাঁকাভাবে কয়েকটি রুশ শব্দ লিখে গেছে, কিন্তু নামসই করেনি।

'আমি মরতে চলেছি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করব না।

বিদায় আমার মাতৃভূমি! ২০. ৭. ৪১।'

যে প্ল্যাস্টারের উপর এই লেখাটি ছিল সেটিকে সযত্নে তুলে আনা হয় মস্কোতে। পরে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর



ব্যারাকের একটি দেয়ালের ওপর হাতের লেখা

যাদুঘরে এটি প্রদর্শিত হয়। এখন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যে জার্মান দলিলে ১৯৪১এর ৩০শে জুন ব্রেস্ত কেল্লার পতন ঘটেছে বলে যে তারিখ দেওয়া হয়েছে তা মিথ্যে।

ক্রমে প্রতিরোধের বিশদ বিবরণ আরও জানা যায়। যুদ্ধের পর দুর্গের কয়েকটি বাড়ি উদ্ধার করা হয়। বাড়ি তৈরীর কাজে লাগাবার জন্য ধ্বংসস্তূপ থেকে ইঁট বাছাই করা হয়। এই কাজের সময় দুর্গরক্ষীদের দেহাবশেষ, তাদের পোষাক ও দলিলপত্র পাওয়া যায় ধ্বংসস্তূপের নীচ থেকে। ব্রেস্তের লোকরা সামরিক মর্যাদাসহ এই সব বীরদের সহরের সমাধিশালায় সমাধি দেয়। ধ্বংসস্তূপের ভিতর আবিষ্কৃত তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য জিনিষ প্রদর্শিত হয় দেশের সর্বত্র বিভিন্ন যাদুঘরে।



লেফ্‌টেনাণ্ট আলেক্সেই নাগানভ

১৯৪৯ সালে তে-রেস্পল্‌ গেটের ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের সময় ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের লেঃ আলেক্সেই নাগানভের দেহাবশেষ পাওয়া যায়। সে প্রতিরোধের প্রথম দিকে মারা যায়। কমসমল সদস্যের কার্ড পাওয়া যায় তার পকেটে। এই থেকে ওর পরিচয় মেলে। মৃত লেফ্‌টেনাণ্টের পাশে তার পিস্তল গুলি ছোড়ার জন্য প্রস্তুত।

অন্যান্য দুর্গরক্ষীদের চিঠি ও দলিলপত্র, একটি পতাকা এবং শেষ পর্যন্ত '১ নং আদেশনামা' ঐ একইভাবে আবিষ্কৃত হয়। উক্ত আদেশনামার ফলে দুর্গের শৌর্যপূর্ণ প্রতিরোধে যারা নেতৃত্ব করেছিল তাদের নাম নিশ্চিতভাবে জানা যায়। পাথরের নীচ থেকে উদ্ধার করা হয় সোভিয়েত সৈন্যের ভাঙা, মরচে পড়া রাইফেল, পিস্তল, সাবমেশিনগান। দেখা গেল বন্দুকে কার্তুজ থাকলে তা গুলি ছোড়ার জন্য প্রস্তুত। এর দ্বারা প্রমাণ হল ওরা লড়াই করতে করতে মারা গেছে।

শেষ পর্যন্ত যারা লড়াই করেছে তাদের অস্ত্র শুধু নয়, সেই লোকদেরও খুঁজে পাওয়া গেল। দেখা গেল দুর্গরক্ষীদের কেউ কেউ তখনো বেঁচে আছে। তাদের সংখ্যা খুবই কম, কেউ কেউ জার্মান বন্দী শিবিরের সব রকম বীভৎসতা দেখেছে, কেউ বা পালিয়ে গিয়ে পার্টিজানদের সঙ্গে মিলে পরে সৈন্যদলে যোগ দিয়েছে।

আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে ওরা

ক্রাস্নোদারের প্রান্তে, দ্রুত গড়ে-ওঠা সহরের নূতন এক রাস্তায় অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের গড়ে-তোলা বাড়ির সারির ভিতর দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোট্ট সাদা কুটির — চারপাশে সযত্নে জন্মান ঘন আঙুরের বাগান। প্রথম বসন্তের সকালে, গ্রীষ্মের তপ্ত দিনে, হেমন্তের আবছা আলোয় সৈনিকের টিউনিক ও লম্বা বুট-পরা একজন বয়স্ক লোক সবুজ বাগানে দীর্ঘ সময় কাটাচ্ছে — আঙুরলতা বাঁধছে আর ছেঁটে দিচ্ছে। চোয়ালের হাড় উঁচু, চওড়া মুখ, কালো চোখদুটিতে সংকল্প-দৃঢ় দৃষ্টি।

সে মেজর পিওতর গাভ্রিলভ। বর্তমানে অবসর নিয়ে পেনসন ভোগ করছে। ব্রেস্ত কেল্লার বীরবৃন্দেরই একজন সে, পূব গড়ের অধিনায়ক। লড়াইয়ের দ্বাত্রিংশ দিনে দুর্গের কুঠরীতে জার্মানরা ওকে ঘেরাও করে। কোন রকমে প্রাণে

বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তার সাহস ও সমর দক্ষতায় সেই অসম যুদ্ধে শত্রু চমৎকৃত হয়।

দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য চারটি বছর সে কাটায় হিটলারের বন্দী শিবিরে। ১৯২২ থেকে সে কমিউনিস্ট, যোগ দেয় গৃহযুদ্ধে। বন্দী দশায় বলশেভিক ও সোভিয়েত অফিসারের উপযুক্ত আচরণ করে যাবতীয় দুর্দৈবের মুখে সমাজতান্ত্রিক জন্মভূমির নাগরিক হিসেবে সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখে।

মুক্তির পর দেশে ফিরে তার মেজর পদ ফিরে পায় এবং কিছুদিন বাদেই সাইবেরিয়ায় জাপানী যুদ্ধবন্দীদের সোভিয়েত শিবিরের প্রধান নিযুক্ত হয়। নাজি বন্দী শিবিরের বীভৎসতা তার মনে তখনো সজাগ, তাই গাভ্রিলভ তার শিবিরটিকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান বানিয়ে বন্দীদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে। জাপানীদের মধ্যে সংক্রামক টাইফাস রোগকে নিরোধ করে এবং জাপানী অফিসাররা তাদের সৈনিকদের জিনিষপত্র বিলিতে যে অনাচার চালায় তা বন্ধ করে। এই বছর কয়টিতে সে যে প্রকৃত মানবিক ও সোভিয়েতসুলভ কাজ দেখায় তার প্রমাণ হল কম্যাণ্ডিং অফিসারদের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি।

এরপর সে অবসর ও পেনসন নিয়ে সস্ত্রীক চলে যায় ক্রাস্নোদারে বসবাস করতে। বিভিন্ন সৈন্যদলের অধিনায়ক হিসেবে এর আগে বহু বছর ওখানে থেকেছিল। বর্তমানে গাভ্রিলভ সোভিয়েত সমর অভিজ্ঞ কমিটির সদস্য। সক্রিয় জনসেবক হিসেবে সৈন্যদলে, কারখানায় এবং ক্রাস্নোদারের

ইস্কুলে ব্রেস্ত কেল্লায় যা দেখেছে এবং অভিজ্ঞতা পেয়েছে তা বলে।

যারা সেই শৌর্যপূর্ণ প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিল তারাও বাস করে ক্রাস্নোদারে। গাভ্রিলভের যুদ্ধকালীন বন্ধুরা তার ছোট্ট ভবনটিতে প্রায় এসে ঘরে-তৈরী মদ খেতে খেতে গম্পগুজব করে। এর ভেতর আছে সার্জেণ্ট আনাতোলি কোর্জ, বর্তমানে টেকনিশিয়ান, টার্ণার আনাতোলি বেস্সোনভ, মাধ্যমিক ইস্কুল শিক্ষক পিওতর তেলেঙ্গা, আর বর্তমানে গেলেন্দ্জিক আরাম নিবাসের কর্মীদলভূক্ত ভ্লাদিমির পুজাকভ। একত্রে তারা মরিয়া হয়ে লড়াই করার স্মরণীয় দিনগুলোকে মনে করে, যে সব বন্ধুরা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে স্মরণ করে তাদের। তাদের মধ্যে আছে ক্যাপ্টেন ইভান জুবাচিওভ, বন্দী শিবিরে নাজি অত্যাচারে সে মারা যায়। তাদের নিজ দেশ কুবানের লোক ভাসিলি বিৎকোর কথা মনে আসে। এর পরিবারের সঙ্গে ওরা আবিন্স্কায়া আঞ্চলিক কেন্দ্রে মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ করে। এমনি আছে আরও অনেকে। তাদের যুদ্ধকালীন বন্ধুত্বের চাইতে দৃঢ় আর কিছুই নয়, রুশ দুর্গ প্রাচীরে স্বাদেশিক যুদ্ধের যে মারাত্মক আগুন তাই দিয়ে এই বন্ধুত্ব জোড় লাগান।

ককেসাসের অপর দিকে, সুদূরে দক্ষিণে একেবারে তুরস্ক সীমান্তের উপরে আর্মেনিয়ায় গম্ভীরমূর্তি পাহাড়ের মাঝখানে একদল ভূতাত্ত্বিক মহার্ঘ ধাতুর জন্য পাহাড়ী মাটি খুঁড়ে চলেছে। এর নেতৃত্ব করছে দৃঢ়-গঠন চল্লিশ বছরের

এক ইঞ্জিনিয়ার, চোখদুটো আনন্দোজ্জ্বল, ভাবভঙ্গীতে উৎসাহ।

ইঞ্জিনিয়ারের নাম সামভেল মাতেভোসিয়ান। সে রেজিমেন্টের কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারী। প্রতিরোধের প্রথম দিকে রেজিমেন্টের কমিশার ফোমিনের অন্তরঙ্গ সহকারী হয় এবং তার কমসমল সদস্যদের দিয়ে দুঃসাহসী সঙ্গীন আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে কেন্দ্রীয় দুর্গে প্রথম প্রবেশকারী জার্মান সাবমেশিনগানচালকরা নিশ্চিহ্ন হয়।

সেই প্রথম দিনটিতে দুবার আহত হয়েও মাতেভোসিয়ান ক্ষতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিজ সৈন্য পরিচালনা করে। তৃতীয় দিন সকালে গুরুতর আঘাতের ফলে সে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। তাকে পাঠান হয় শ্বেত প্রাসাদের সেলারে। বহুদিন বাদে বিকার অবস্থায় তাকে বন্দী করে শত্রুসৈন্য।

দক্ষিণ সামরিক ক্যাণ্টনমেণ্টের বন্দী শিবিরে পাঠান হয় তাকে। ক্ষত সেরে আসতেই সে পালাবার মৎলব করতে থাকে। ১৯৪১এর শরতে মাতেভোসিয়ানের নেতৃত্বে ছ'জন অফিসার ও সৈন্য রাত্রিবেলা তার-কাটার বেড়া পেরিয়ে পাশের জঙ্গলে পালিয়ে যায়।

এরপর মাতেভোসিয়ান পশ্চিম উক্রেন ও পশ্চিম বেলোরুশিয়ায় দেশের লোকদের সঙ্গে একত্রে লড়াই চালায়, আবার গুরুতর আহত হয় সে, জার্মান নিযুক্ত পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে এসে লুত্স্ক সহরে ফ্যাশিস্ট বিরোধী গুপ্ত

আন্দোলনের নেতৃত্ব করে। সোভিয়েত সৈন্য যখন সহরের দিকে এগিয়ে আসে মাতেভোসিয়ান ও তার লোকেরা বিদ্রোহ সংগঠিত করে সোভিয়েত সৈন্যকে ত্বরায় সহরটি দখল করতে সাহায্য করে।

পরে তাকে পাঠান হয় অফিসারদের শিক্ষা ইস্কুলে। সেখান থেকে সে ফ্রণ্টে ফিরে আসে রক্ষীদলের গার্ডের লেফ্‌টেনাণ্ট এবং গার্ডের হানাদার কোম্পানির কম্যাণ্ডার হয়ে। এই দলের অধিপতি হিসেবে সে বার্লিনের উপর আক্রমণ করার মহান অভিযানে অংশ নেয়। রাইখ্‌স্টাগের দেয়ালে যারা নাম সই করে সে তাদের একজন। দেশরক্ষার মহান যুদ্ধে সামভেল মাতেভোসিয়ান সাতবার আহত হয় এবং দুটি সামরিক সম্মানপদক পায়।

বিউগলবাদক পেতিয়া ক্লিপা ব্রেস্ত দুর্গের সর্ব কনিষ্ঠ বীর। সেও প্রাণে বাঁচে। আটজন লোককে নিয়ে পতাপভের দল দুর্গ বেষ্টনী ভেদ করার যে চেষ্টা করে তাতে সে পালিয়ে আসে। পরের দিন বুগের অপর তীরে জার্মানদের হাতে বন্দী হয়। পোলীয় অঞ্চলে এক বন্দী শিবিরে নেওয়া হয় ওকে।

সেখানে ওরই মত অন্যান্য রেজিমেণ্টের বালক সৈন্যের সঙ্গে ওর দেখা হয়। বয়সে ওদের চাইতে ছোট হলেও ওর উদ্দীপনা ও দুঃসাহস তাদের মনে এমনই রেখাপাত করে যে অল্পসময়ের মধ্যে সে ওদের নির্বাচিত দলপতি হয়ে দাঁড়ায়। সোৎসাহে পালাবার মৎলব আঁটতে থাকে সে এবং কিছুদিনের মধ্যেই আর পাঁচজন ছেলেকে নিয়ে শিবির থেকে

গা-ঢাকা দিয়ে ব্রেস্তের কাছে এক গ্রামে ঢুকে পড়ে স্থানীয় চাষীদের সঙ্গে কাজ করতে থাকে।

পেতিয়ার কিন্তু অন্য বাসনা ছিল। সে চেষ্টা করল তার বন্ধুদের বুঝিয়ে পূব দিকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর পিছু ধরবে যাতে ফ্রন্ট পেরিয়ে আবার সৈন্যদলে যোগ দেওয়া যায়। শত্রুকে আবার এক হাত দেখাবে এই ইচ্ছে তার।

শেষটায় ভলোদিয়া কাজ্‌মিন নামে ওর এক বন্ধু পেতিয়ার কথায় রাজী হল, দুজন মিলে রওনা দিল বেলোরুশিয়ার দীর্ঘ বন আর জলাভূমির পথ ধরে। বহু শত মাইল পার হয়ে ওরা আটকা পড়ল জার্মান অধিকৃত গ্রাম্য পুলিশের হাতে। এরপর ওদের পাঠান হল জার্মানীতে কাজ করতে।

পেতিয়ার ভাগ্যে জুটেছিল অনেক দুর্দশা। এখন সে সব শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে একজন পাকা টার্নার, কাজ করে ব্রিয়ান্‌স্কের 'স্ত্রোম্‌মাশিনা' কারখানায়। ঐ সঙ্গে সে বয়স্কদের জন্য একটি ইস্কুলে পড়াশুনাও করে। এখান থেকে সে টেক্‌নিক্যাল ইস্কুলে যোগ দেবে। ব্রেস্ত দুর্গের এই বালক রক্ষীকে জানে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত মানুষ, যথার্থই ওরা ওকে নাম দেয় 'সোভিয়েত গাভ্রোস'।

পেতিয়ার সঙ্গে ওর বন্ধু ভলোদিয়া কাজ্‌মিন যে ফ্রন্ট লাইন পথ ধরে এগিয়ে ছিল, বেঁচে আছে সেও। এখন সে ভরোনেজ অঞ্চলে পাভ্‌লভ্‌স্ক সহরের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের



আলেক্সান্দ্র্ রেব্‌জ্‌ইয়েভ, ১৯৫৬



আলেক্সান্দ্র্ ফিল, ১৯৫৬

ইঞ্জিনিয়ার। দুর্গরক্ষী এদের আর এক বন্ধু পিওতর কতেল্‌নিকভ বর্তমানে সিনিয়র লেফ্‌টেনান্ট, কাজ করছে বাল্টিকের তীরে।

এই সেদিনও দুর্গের বীর নায়িকা রাইসা আবাকুমভাকে মৃত বলে মনে করা হত, কিন্তু পরে জানা যায় সে ওরিওল অঞ্চলে ক্রোমি জেলা হাসপাতালে কাজ করছে। এর বন্ধু ভালেন্তিনা রাইয়েভ্‌স্কায়া যুদ্ধের প্রথম দিনেই জার্মান বোমার টুকরোয় আহত হয়। ওরিওলের কাছে ম্‌ৎসেন্সক সহরে এক হাসপাতালে সে নার্সের কাজ করছে।

বিখ্যাত ব্রেস্ত দুর্গের প্রতিরোধী বীরদের অনেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে। সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট আনাতোলি ভিনোগ্রাদভ কেন্দ্রীয় দুর্গ থেকে এক দল লোক নিয়ে বেষ্টনী ভেদের চেষ্টা করেছিল। সে এখন ভলোগ্দার কারখানায় কর্মকার। ভাসিলি বিৎকোর সঙ্গী সংযুক্ত দলের হেডকোয়ার্টারের কর্তা সিনিয়র লেফ্টেনাণ্ট আলেক্সান্দ্র্ সেমেনেন্কো এখন উক্রেনীয় সহর নিকোলায়েভে ড্রাইভারি করে। ৮৪ নং রেজিমেণ্টের সৈনিক আলেক্সান্দ্র ফিল ফোমিন ও জুবাচিওভের সঙ্গে একত্রে লড়াই করে। সে এখন ইয়াকুতিয়ার সুদূর স্বর্ণখনির বনাঞ্চলের অধ্যক্ষ। এরই বন্ধু সিনিয়র সার্জেণ্ট আলেক্সান্দ্র্ রেব্জুইয়েভ ভেলিকিয়ে লুকি অঞ্চলের গ্রাম্য ইস্কুলের হেডমাস্টার।

৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের প্রাক্তন লেফ্টেনাণ্ট আলেক্সান্দ্র্ সানিন পতাপভ ও কিজেভাতভের সঙ্গে তেরেস্পল্ গেটে যুদ্ধরত সৈন্যদের পরিচালনা করে। সে এখন ওম্স্কের ইস্কুলে ভূগোল শিক্ষক। পেতিয়া ক্লিপার সঙ্গী ইভান বুগাকভ সাহসী বেলোরুশীয় পার্টিজানদের অন্যতম। সে সারাতেভ অঞ্চলের রাষ্ট্রীয় খামারে ইলেক্ট্রিসিয়ান। ৩৩৩ নং রেজিমেণ্টের লেঃ দ্মিত্রি বেলোমোইন কাজাখস্তানের পেত্রোপাভ্লভ্স্ক সহরের মিলিসিয়া বাহিনীর মেজর। নবম সীমান্ত চৌকির সৈনিক সেগেই বরিওনক, যে একত্রে আন্দ্রেই কিজেভাতভের সঙ্গে লড়াই চালায়, ল্ভোভের জান্কোভেত্স্কায়া নামে থিয়েটারের অভিনেতা।

বিনয়ী, সাদাসিধে এই সোভিয়েত মানুষগুলি দেশরক্ষার কাজে যেমন অগ্রণী ছিল তেমনি দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এরা পুরোগামী।

যারা ব্রেস্ত দুর্গের অবিনাশী প্রতিরোধে অংশ নিয়েছিল তাদের প্রত্যেকে সেই শৌর্যময় ও মর্মান্তিক দিনগুলির পবিত্র স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এদের স্মৃতি আমাদের সাহায্য করছে দেশরক্ষা মহান যুদ্ধের সেই প্রথম কয়েক মাসে সোভিয়েত সৈন্যদের মহান সামরিক কৃতিত্বের কথাকে আরও বিশদভাবে জানতে।

দেশের এই মাটিতে ওরা লড়াই করেছিল

১৯৫৪ সালে গ্রীষ্মের এক উজ্জ্বল দিনে বহু লোক ব্রেস্ত দুর্গের কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণে এসে জড় হয়। এর ভিতর আছে ব্রেস্ত সহরের নাগরিকেরা, ব্রেস্ত গ্যারিসনের সৈন্য: সৈন্যবাহিনীর তরুণরা যুদ্ধের সময় যারা ছিল বালকমাত্র এবং অভিজ্ঞ অফিসারবৃন্দ যাদের পোষাকে শোভা পাচ্ছে মস্কো, স্তালিনগ্রাদ, বুদাপেষ্ট, ভিয়েনা ও বার্লিনের পদক।

দলটি অর্ধবৃত্তাকারে বসল ঘাসের উপর। তাদের পিছনে বুলেট ক্ষত, আধ-ধ্বসা দুর্গের গির্জাঘর। এটাই ছিল গ্যারিসনের ক্লাব। দৃশ্যটা ভয়ঙ্কর। এই বিরাট অট্টালিকার দেয়াল বিধ্বস্ত, জানলাগুলো হা করা, চূড়োটা ভাঙা, সবকিছু ধ্বংসস্তূপে পরিণত। তার উপর গজিয়েছে ঘাস আর ঝোপঝাড়।

বাঁ দিকে শ্বেত প্রাসাদের বিকটাকৃতি ধ্বংসাবশেষ, ডান দিকে মুখাভেৎস্ ও বুগের সঙ্গমস্থলে নজরে পড়ে তেরেস্পল্ গেট ও লাল ইঁটে গড়া বৃত্তাকার ব্যারাকের অবশিষ্টাংশ।

ঘাসের উপর বেঞ্চ ও লম্বা টেবিল পাতা। একদল নরনারী বসল তার উপর। এরাই তের বছর আগে এই দুর্গ রক্ষা করেছিল।

প্রাক্তন কমসমল সঙ্ঘের সেক্রেটারী এবং ৮৪ নং রেজিমেন্টের সহকারী রাজনৈতিক সংগঠক সাম্ভেল মাতেভোসিয়ান এসেছে অনেক দূর থেকে বিধ্বস্ত দুর্গের প্রতি সম্মান জানাবার জন্য। তিনবার এই পাথরে পড়েছে তার রক্তের দাগ, বন্ধুরা এরই মাটিতে সমাধিস্থ।

বেলোরুশিয়ার রাজধানী মিন্স্ক থেকে এসেছে আর একজন বীর। সে লেঃ আলেক্সান্দ্র্ মাখ্নোচ, ৪৫৫ নং পদাতিক রেজিমেন্টের পল্টন অধিনায়ক। এখন সাংবাদিকের কাজ করে বেলোরুশিয়ায়। মাতেভোসিয়ানের মত সেও এখানে সংগ্রাম করেছে, দুর্গ প্রাচীরে ঢেলে দিয়েছে তার রক্ত। সোভিয়েত সৈন্যের টিউনিক পরে এক নাজি গুপ্তচর তাকে পিঠে গুলি মারে। গুরুতর আহত হয় সে।

স্থানীয় মেডিক্যাল ইস্কুলের ছাত্রী ক্যাপ্টেন শাব্লভ্স্কির কন্যা তানিয়া, অফিসার আরশিনভ-নিকিতিন ও বুলিগিনের স্ত্রী — তারা শিশুসহ আশ্রয় নিয়েছিল দুর্গের সেলারে। সেখানে উপস্থিত এরাও।

১৯৪১এ দুর্গে কী ঘটেছিল সেই চমকপ্রদ কাহিনী ওরা

শুনল সাশ্রুনয়নে। মাতেভোসিয়ান ও মাখ্‌নাচ বলল তাদের সঙ্গীদের সামরিক কৃতিত্বের কথা, সেই অসম যুদ্ধে ওদের বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্প, শত্রুর প্রতি জ্বালাময়ী ঘৃণা ও মাতৃভূমির প্রতি ভালবাসার কথা। তারই ফলে এই সংগ্রামের অমানুষিক দুঃখকষ্টকে ওরা জয় করে। সেই অত্যাশ্চর্য কাহিনী শুনল তরুণ সৈনিকরা, মুখে তাদের গাম্ভীর্য ও ঐকান্তিকতা। পিতা ও বড় ভাইদের শৌর্যপূর্ণ কৃতিত্ব ওদের কাছে উদাহরণস্বরূপ। পরে তাদেরই অনুরোধে সেই বীর দুর্গরক্ষীদের ধ্বংসস্তূপের চারপাশ ওদের ঘুরিয়ে দেখান হল।

'এখানে একটা ঘর ছিল, তাতে রাখতাম আমাদের আহত লোকদের,' ব্যারাকের উত্তরাঞ্চলে ঘাস-গজা ধ্বংসস্তূপের উপর গিয়ে বলল মাখ্‌নাচ। 'একটা জার্মান ট্যাঙ্ক ভিতরে ঢুকে ওদের সবাইকে পিষে মারে,' যোগ করে সে। তরুণ সৈনিকরা গম্ভীর মুখে এই কথা শুনল, নাজি ট্যাঙ্কচালকদের এই অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কথা চিন্তা করে ওদের হাত হল মুষ্টিবদ্ধ।

মাতেভোসিয়ান বড় একটি দলকে নিয়ে গেল শ্বেত প্রাসাদে। কমিশার ফোমিন এটিকে রক্ষার ভার দিয়েছিল ওরই উপর। ধ্বংসস্তূপ ছাড়া অতি সামান্যই এর অবশিষ্ট, তবু জায়গায় জায়গায় ভারি লোহার রেলিংসহ কংক্রীট করা বাইরের দেয়াল তখনো অক্ষত।

সবাই দেয়ালের এক কোণায় গোল হয়ে দাঁড়াল।

মাতেভোসিয়ান বলল, 'এখানে আমাদের একটা মেশিনগান ছিল। ফ্যাশিস্টদের দখল করা ক্লাবঘরের জানলায় এরই থেকে



ব্রেস্ত শহরে আলেক্সান্দ্র্ মাখ্‌নাচ ও সাম্‌ভেল মাতেভোসিয়ান, ১৯৫৪

আমরা গুলি ছুড়তাম। মনে হয় আশপাশের মাটির নীচে আপনারা কার্তুজের খোলা পাবেন।'

একজন সৈন্য কোদাল এনে মাটি খুঁড়তে লাগল, সত্যিই মাটি খুঁড়তে কোদালভর্তি উঠতে লাগল ফাঁকা কার্তুজের খোলা, সোভিয়েত মেশিনগানের কার্তুজ এগুলি, বহুদিন মাটি চাপায় সবুজ হয়ে আছে। কিন্তু কার্তুজের খোলা ছাড়া আরও কিছু ছিল সেখানে।

আলগা মাটির ফাঁকে সাদামত কী একটা দেখা গেল। মাতেভোসিয়ান ওটাকে কুড়োবার জন্য চট করে নিচু হল।

মানুষের মাথার খুলির একটা টুকরো, ঠিক মাঝখান দিয়ে বুলেটের এক ছিদ্র। নিঃশব্দে মাতেভোসিয়ান খুলিটাকে পরীক্ষা করতে লাগল, তার মুখ মলিন হয়ে গেল, খুলি-ধরা হাতটা ঈষৎ কাঁপছে।

গম্ভীর গলায় বলল, 'আমাদেরই একজন। ফ্যাশিস্টরা নিজের লোককে সহুরে কবর দিয়েছে।'

সে মাথা তুলে সৈন্যদের দিকে চাইল। চোখে জল। কাঁপা গলায় বলল:

'এই পাথরের নীচে ওঁদের অনেকে শুয়ে আছে। কমরেডগণ, এঁদের মনে রাখবেন।'

সবাই নিঃশব্দ, কথার কোন প্রয়োজন নেই। তরুণ সৈনিকদের মুখ দেখে সহজেই অনুমান করা যায় ১৯৪১এর এই বীরদের কীর্তি তাদের মনে থাকবে। যারা এই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপে প্রাণ দিয়েছে তাদের কথা ওদের মনে সাহস ও দেশাত্মবোধক নিষ্ঠার উদাহরণ হিসেবে চির জাগরূক থাকবে — ওরা যে এদেরই উত্তরাধিকারী।

অপেক্ষমাণ লরির দিকে ফিরে আসার সময় সার্জেণ্ট-মেজর বরিস ওর্লভ ওদের বলল কী ভাবে দুর্গ গ্যারিসনের একজন প্রাক্তন সৈন্যের সঙ্গে তার দেখা হয়। ওর্লভ বহুকাল যাবৎ সৈন্যদলে আছে, যুদ্ধের সময় থেকে প্রায় দশ বছর পর্যন্ত ব্রেস্তে।

ঘটনাটা ১৯৫১ বা ১৯৫২ সালের। ওর্লভের অধীনে একদল সৈন্য কাজ করছিল কেন্দ্রীয় দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে। এমন সময় সহরের দিক থেকে একখানা ট্যাক্সি আসে পড়ল,

পেরিয়ে। ট্যাক্সি থামে খোল্‌ম্‌ গেটে, নেবে আসে একজন অফিসার। টুপি ন্যাবিয়ে সে ব্যারাক বরাবর তেরেস্পল্‌ গম্বুজের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। ওর্‌লভের সৈনিকরা যেখানে কাজ করছিল সেখান থেকে গম্বুজটা দূরে নয়।

গম্বুজের ধ্বংসাবশেষের কাছে থামল অফিসার। ভদ্রলোক মেজর, বয়স প্রায় চল্লিশ। কালো চুলে সাদার ছোপ স্পষ্ট, গম্ভীর টানটান চেহারা। বুকে দু'সারি অর্ডার ও মেডেল।

খালি মাথায় দাঁড়িয়ে মেজর ধ্বংসস্তূপের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে, সৈন্যদের উপর নজর দিচ্ছে বলে মনে হল না। সৈন্যরাও ওকে বিশেষ খেয়াল করল না। যে সব অফিসাররা বাইরে কাজ করতে যায় বা বিদেশ থেকে ফেরে, ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় তারা আসে দুর্গ দেখতে। দুর্গের চমকপ্রদ কাহিনী ওরা শুনেছে। সৈন্যরা বহুদিন ধরে এই ধরনের দর্শকদের দেখে আসছে।

কিন্তু এরপর যা ঘটল তা এমনই অস্বাভাবিক যে ওরা সেদিকে নজর না দিয়ে পারল না। হঠাৎ সেই অজানা অফিসারটি দু'হাতে মুখ চেপে হাঁটু মুড়ে বসে বুক চেপে ধরল নোংরা ধূসর বাদামী ধুলো মাটির উপর। সৈন্যরা তার বুক ফাটা কান্না শুনতে পেল।

সার্জেণ্ট-মেজর আর তার দুজন সৈন্য গেল অফিসারের কাছে।

'কী ব্যাপার, কমরেড মেজর?' সহানুভূতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করল ওর্‌লভ।

মেজর চমকে উঠে চারদিকে চাইল। সৈন্যদের দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখ জলে ভেসে গেছে, ঘন ভ্রূর মাঝখানে দুঃখের গভীর রেখা।

'একচল্লিশে এখানে আমরা লড়াই করেছি,' সংক্ষেপে বলল সে।

সহানুভূতি ও কৌতূহল নিয়ে সৈন্যরা তাকাল মেজরের দিকে, ওরা যেন আশা করছে সেই স্মরণীয় দিনগুলি সম্পর্কে সে কিছু বলবে। কিন্তু কিছুই বলল না। সেখানে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে চোখ মুছল। তারপর সার্জেণ্ট-মেজর ও তার সৈন্যদের নমস্কার জানিয়ে গাড়ীতে উঠল।

'আমি ওঁর নাম জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেন যেন পারলাম না,' বলল ওর্‌লভ। 'এতই বিচলিত দেখলাম ওঁকে।'

'আমরা জানি না এমন অনেকেই হয়ত বেঁচে আছেন,' গম্ভীরভাবে বলল একজন অফিসার। 'হয়ত ওঁরা দেশময় ছড়িয়ে আছেন ...'

অফিসারটি ঠিকই বলেছে। এই ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দুর্গরক্ষীদের দুই শত লোকের কথা জানা গেছে। এরা ব্রেস্ত থেকে মাগাদান ও মুর্‌মান্‌স্ক্‌ থেকে ইয়েরেভান জুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন সহর ও গ্রামে বসবাস করছে।

... দুর্গে সেই যে একদল লোক জমায়েত হয়েছিল তাও প্রায় দু'বছর হয়ে গেল। ১৯৫৬ সালের জুলাইয়ে সোভিয়েত জনগণ ব্রেস্ত দুর্গ প্রতিরোধের পঞ্চদশ বাৎসরিক উৎসব পালন

করে। সেই উপলক্ষে যে সম্মান-সন্ধ্যা পালিত হয় তাতে যোগ দেবার জন্য দুর্গরক্ষীদের অনেকে মস্কো আসে।

সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রীয় ভবনের হোটেলে যে সব দেখা-সাক্ষাৎ হয় তা খুবই মর্মস্পর্শী। পূব গড়ের অধিনায়ক পিওতর গাভ্রিলভের সাক্ষাৎ হয় প্রাক্তন হেডকোয়ার্টারের কর্তা ক্যাপ্টেন কন্স্তান্তিন কাসাত্কিনের সঙ্গে। বর্তমানে ইয়ারোস্লাভ্লের এক কারখানায় সে একজন ইঞ্জিনিয়ার। রাইসা আবাকুমভা ও ৪৪ নং রেজিমেণ্টের প্রাক্তন সৈনিক বন্ধু আলেক্সান্দ্র সেমেনেন্কোর সঙ্গেও তার সাক্ষাৎ হয়। তার পুরোনো বন্ধু রেজিমেণ্টের কোয়ার্টার-মাস্টার নিকলাই জোরিকভকে জড়িয়ে ধরে সেমেনেন্কো নিজেই কেঁদে ফেলে। প্রতিরোধের সময় এর একখানা হাত নষ্ট হয়ে যায়। সে কালিনিন অঞ্চল থেকে মস্কো এসেছে। পেতিয়া ক্লিপার সাক্ষাৎ হয় তার সৈনিক বন্ধু মিখাইল গুরেভিচের সঙ্গে। গুরেভিচ এখন মিন্স্ক ফিলারমনিক অর্কেস্ট্রাভুক্ত শিল্পী। বর্তমানে ভোলগ্দায় কর্মকার লেঃ আনাতোলি ভিনোগ্রাদভ ও মস্কোর গ্যারেজ ম্যানেজার প্রাক্তন রাজনৈতিক সংগঠক পিওতর কশ্কারভ সানন্দ চিৎকারে পরস্পরের দিকে ছুটে যায়। পরলোকগত কমিশার ফোমিনের ছেলেকে আবেগভরে আলিঙ্গন করে সাম্ভেল মাতেভোসিয়ান। ছেলেটি কিয়েভের তরুণ ব্যারিস্টার।

বীর যোদ্ধারা দেখা দেয় মস্কোর টেলিভিশনে, পরিদর্শন করে রাজধানীর সৈন্যদল ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। সর্বত্র



মস্কোতে দুর্গের প্রাক্তন রক্ষীরা। বাঁ দিক থেকে—পিওতর কশ্‌কারভ, সাম্‌ভেল মাতেভোসিয়ান, ফিওদর জাবির্‌কো, কন্‌স্তান্তিন কাসাত্‌কিন, পিওতর ক্লিপা

মস্কোবাসীরা এদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়। এরপর সান্ধ্য উৎসব পালিত হয় সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রীয় ভবনে 'লাল পতাকা হলঘরে'। এতে যোগ দেয় শত শত মস্কোবাসী, জেনারেল, অফিসার ও সোভিয়েত সৈন্য।

কয়েক দিন বাদে প্রাক্তন দুর্গরক্ষীদের কয়েকজন কেল্লা দেখতে যায়। পথে গাভ্রিলভ, মাতেভোসিয়ান, ক্লিপা, আবাকুমভা ও ভিনোগ্রাদভের সঙ্গে যোগ দেয় আলেক্সান্দ্র মাখ্‌নাচ, ফিওদর জুরাভলিওভ, মিখাইল গুরেভিচ ও আলেক্সান্দ্র পেত্‌লিৎস্কি। এরা বাস করে মিন্‌স্কে।



দুর্গের প্রাক্তন রক্ষীদের দুর্গে প্রবেশ



স্মরণীয় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে

ভেজা, আবছা সকালে গাড়ী ঢুকল ব্রেস্ত স্টেশনে, কিন্তু অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য শত শত সহরবাসী ফুল ও ব্যান্ড নিয়ে সেখানে হাজির। প্রিয়তম বন্ধু হিসেবে ওদের তারা স্বাগত জানাল। জনতার ভিতর ছিল দুর্গরক্ষীদের অন্যান্য সৈন্য, এখন বাস করে ব্রেস্ত অঞ্চলে। এর ভিতরে আছে পূব গড় রক্ষাকারী লেঃ ইয়াকভ কলমিয়েৎস্, ৪৪ নং রেজিমেণ্টের র‍্যাঙ্কার গ্রিগরি গুদিম, প্রাক্তন সিগ্নালার ও বর্তমানে সমৃদ্ধ যৌথখামারের চেয়ারম্যান মার্ক পিস্কুন, পরলোকগত ক্যাপ্টেন জুবাচিওভের স্ত্রী ও পুত্র, বীর নিকলাই নেস্তের্চুকের স্ত্রী ও কন্যা এবং অন্যান্য শহীদদের পরিবারবর্গ। ঘটনাটি অবিস্মরণীয়।

এই দিনটিতে দুর্গরক্ষীরা ও শহীদদের পরিবারবর্গ দুর্গ দেখতে যায়। গভীরভাবে বিচলিত হয়ে ওরা কেল্লায় ঢোকে নিঃশব্দ গাম্ভীর্যে, হাতে বড় বড় ফুলের তোড়া। তাদের সঙ্গীরা যেখানে প্রাণ উৎসর্গ করেছে ফুল ছড়িয়ে দেয় সেই সব জায়গায়। যে সেলারের ছাদে ক্যাপ্টেন জুবাচিওভের হেডকোয়ার্টার ছিল সেখানে সর্বপ্রথম ফুলের তোড়া দেয় ক্যাপ্টেনের স্ত্রী ও ছেলে। যে দেয়ালের উপর নাজিরা রেজিমেণ্টের কমিশার ফোমিনকে গুলি করে হত্যা করে তার নীচে ফুল অর্পণ করে সাম্ভেল মাতেভোসিয়ান। নেস্তেরচুকের কন্যা লিদা অবরোধের অনেকগুলি দিন ছিল বাবার সঙ্গে সঙ্গে। যেখানে ওর বাবা মারা গেছে সেখানে ফুল দিতে গিয়ে ও ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে।

দুদিন বাদে সহর স্টেডিয়ামে দশ হাজার ব্রেস্তবাসীর এক সভা হয়। সানন্দ উল্লাস ও প্রশংসা ধ্বনিতে বীরদের সম্বর্ধনা জানায় জনগণ, পুষ্পবর্ষণ হয় ওদের উপর আর চলে আবেগময়ী বক্তৃতা। প্ল্যাটফর্ম থেকে অভ্যর্থনার জবাবে ওরা বলে, এই সহর ও ঐ প্রাচীন কেল্লা যেখানে তারা রক্ত ঢেলে দিয়েছে এবং তাদের কমরেডরা মৃত্যু বরণ করেছে তা চিরদিন তাদের স্মৃতিতে প্রিয় ও পবিত্র হয়ে থাকবে।

দুর্গের বহির্প্রাচীর সংলগ্ন যে প্রশান্ত সবুজ সমাধিস্থল সেখানে পরের দিন সকাল বেলা বহু লোককে ঘুরতে দেখা যায়। এখানে আছে একটি বারোয়ারি সমাধিস্থল। দুর্গ পরিষ্কারের সময় যে সব অগণিত নামহীন সৈন্যের অস্থি পাওয়া যায় তাদের সমাধি দেওয়া হয় এখানে।



যে দেয়ালের কাছে কমিশার ফোমিনকে হত্যা করা হয় সেখানে
দুর্গের প্রাক্তন রক্ষীদের পুষ্পাঞ্জলি

দুর্গরক্ষীরা এই সমাধিস্থলে এসে তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়। মাটির স্তূপের উপর ধীরে ধীরে রাখা হয় একটি বিরাট পুষ্পমাল্য আর তারই ওপরে সযত্নে সাজান হয় একখানা লাল



রদিওন সেমেনিউকের হাতে
৩৯৩ নং বিমান-ধ্বংসী
ব্যাটালিয়নের সমর পতাকা

ফিতে। তাতে লেখা: 'আমাদের সমর সঙ্গীদের উদ্দেশে যাঁরা বীরের মৃত্যু বরণ করে — দুর্গরক্ষীদের কাছ থেকে।'

সেই দিন ব্রেস্তবাসীরা তাদের অতিথিদের মর্মস্পর্শী বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

... কয়েক মাস কেটে যেতে আসে আরও একজন স্বাগত অতিথি ব্রেস্ত দুর্গ দেখতে। সে রদিওন সেমেনিউক, কাজ করে কেমেরভো লৌহ ইস্পাত কারখানায়। সে এসেছে সুদূর

সাইবেরিয়া থেকে। আগে ছিল ৩৯৩ নং স্বাধীন বিমান-ধ্বংসী ব্যাটালিয়নের জুনিয়র সার্জেন্ট। এরই উপর ভার ছিল ব্যাটালিয়নের পতাকা রক্ষার। দুর্গ পতনের সামান্য আগে সে পতাকাটিকে বাঁধের ভিতরকার একটি ঘরের নীচে পুঁতে ফেলে। এখন সেই পতাকাটিকে উদ্ধার করতে এসেছে।

উত্তেজনায় দৃঢ়, হেঁটে চলেছে পূব গড়ের দিকে। সেই মহার্ঘ পতাকাটিকে কোন ঘরে পুঁতেছে সেই চিন্তায় মস্তিষ্ক আলোড়িত। যখন সে মাটিতে পা ঠুকে কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'এইখানে!' মনে হল তার সঙ্গীদের প্রত্যেকেরই হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হয়েছে দ্রুততর।

সেমেনিউক নিজে কোদাল হাতে নিল। ধাতব কিছুর সঙ্গে কোদাল ঠেকতেই সে বুঝল তার ভুল হয়নি। ঐ ধাতুনির্মিত বালতিতেই সে পতাকাটিকে রেখেছিল।

পনেরো বছরে বালতিতে মর্চে ধরেছে, ভেঙ্গে ফুটো হয়ে গেছে। মাটির নীচ থেকে ওটাকে তুলতে গিয়ে সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল পতাকার ভাগ্যে কী ঘটেছে কে জানে। ধীরে ধীরে টানল ক্যানভাসের বালতিকে। এটা তার হাতে টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়ল। যে তেরপল দিয়ে পতাকাটি মোড়া তার অবস্থাও তথৈবচ। কাঁপা আঙুলে তেরপল ছিঁড়ল সে।

পতাকাটি আছে অক্ষত, এতটুকুও কালজীর্ণ নয়। সেমেনিউক সবার সামনে পতাকা মেলে ধরল। লাল ভেল্‌ভেটের উপর সোনালী অক্ষর ফুটে উঠল:

'দুনিয়ার মজদুর এক হও!'

এরই নীচে লেখা:

'৩৯৩ নং স্বাধীন বিমান-ধ্বংসী ব্যাটালিয়ন।'

সৈন্যদল দুর্গ প্রাঙ্গণে লাইন করে দাঁড়াল। পতাকাবাহী ও সহকারীরা চলল সামরিক কায়দায় মার্চ করে। তাদের পিছনে বাতাসে উড়তে লাগল লাল নিশান। এরই পিছনে চলল আর একটি দণ্ডহীন পতাকা। অসামরিক পোষাক-পরা দোহারা চেহারার এক ব্যক্তি তার প্রসারিত হাতের উপর এটিকে রেখে এগিয়ে চলল। নীরবে সৈন্যদল ব্রেস্ত দুর্গের বীরদের এই পতাকাকে সম্মান জানালে। এ সেই পতাকা যা উড়েছিল মাতৃভূমির জন্য কঠোর সংগ্রামের সেই ধোঁয়া ধূলির মধ্যে — নিয়ে চলেছে সেই ব্যক্তি যে একে বুকে জড়িয়ে সংগ্রাম করেছে, বাঁচিয়ে রেখেছে উত্তরপুরুষের জন্য।

জুনিয়র সার্জেণ্ট রদিওন সেমেনিউক যে পতাকাটিকে রক্ষা করে সেটিকে দেওয়া হয় ব্রেস্ত দুর্গের বীর প্রতিরোধ সংক্রান্ত যাদুঘরে। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঊনচত্বারিংশত্তম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৫৬ সালের ৮ই নভেম্বর কেন্দ্রীয় দ্বীপের পুরাতন ব্যারাকের এক অংশে এই যাদুঘর খোলা হয়। এই ঘরে আছে শত শত প্রদর্শনী দ্রব্য, যথা দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত অস্ত্র ও দলিলপত্র, দুর্গরক্ষীদের বহু ফটো, মহান সংগ্রামের উদ্দেশ্যে অঙ্কিত চিত্রাবলী এবং সেই সংক্রান্ত বহু প্রবন্ধ ও পুস্তক।

প্রতিদিন বহু দর্শক আসে এই প্রদর্শনী ও দুর্গের

ধ্বংসাবশেষ দেখতে। ব্রেস্ত ও অন্যান্য সহর থেকে প্রায়ই আসে যাত্রীদল।

ব্রেস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশদ্বার, পশ্চিম ইউরোপে যাবার মুখ। সীমান্ত পেরিয়ে যাতায়াতকারী যাত্রীদের নিয়ে প্রতিদিন ট্রেন চলে এর ভিতর দিয়ে। বৈদেশিক প্রতিনিধিদল সোভিয়েত ইউনিয়নে আসে ব্রেস্তের ভিতর দিয়ে।

যারাই ব্রেস্ত স্টেশনে অল্প সময়ের জন্যও অপেক্ষা করে তারাই ছুটে যায় বিখ্যাত দুর্গ ও যাদুঘর দেখতে, শ্রদ্ধা জানায় দুর্গের ধ্বংসাবশেষকে। ব্রেস্ত দুর্গের বীরদের যে কৃতিত্ব তার কথা ছড়িয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে। মানুষের ইতিহাসে সামরিক শৌর্যের মহত্তম কৃতিত্ব হিসেবে তা বেঁচে থাকবে।

সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত সরকার এই কৃতিত্বকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি দিয়েছেন। ১৯৫৭ সালের প্রারম্ভে সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী এক আজ্ঞপ্তি বলে ব্রেস্ত দুর্গ প্রতিরোধের অন্যতম নেতা পিওতর গাভ্রিলভকে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর' উপাধি দান করে, কেন্দ্রীয় দুর্গের গ্যারিসনের পরিচালক কমিশার ফোমিনকে মৃত্যুর পর 'অর্ডার অফ লেনিন' দেওয়া হল। শহীদ ক্যাপ্টেন ই. জুবাচিওভ, ক্যাপ্টেন ভ. শাব্‌লভ্‌স্কি, সিনিয়র রাজনৈতিক সংগঠক ন. নেস্তের্‌চুক, লেঃ আ. নাগানভকে 'মহান দেশরক্ষা যুদ্ধের প্রথম শ্রেণী'র অর্ডারে ভূষিত করা হয়।

স. মাতেভোসিয়ান, র. আবাকুমভা, আ. ভিনোগ্রাদভ, প. কশ্‌কারভ, র. সেমেনিউক এবং দুর্গের অন্যান্য মহান রক্ষীদের 'অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার' দেওয়া হয়। অন্যান্য সৈনিকরা বিভিন্ন ধরনের অর্ডার ও পদক পায়।

সোভিয়েত ভূমি কোনদিনও দুর্গরক্ষীদের মহান ও দেশাত্মবোধক কীর্তির কথা ভুলবে না। সোভিয়েত জনগণ তাদের জানায় যথাযোগ্য শ্রদ্ধা। কমিউনিজমের স্বার্থে সংগ্রামের জন্য ওরা যে নিঃস্বার্থ শৌর্য ও লৌহকঠিন ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে সোভিয়েত তরুণরা।

অনুবাদ: ফল্গু কর
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: রেব্রভ

СЕРГЕЙ СМИРНОВ
ГЕРОИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ, বিষয়বস্তু ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন